চিত্রগত কাহিনী

সপ্তর্ষি

সপ্তর্ষি, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩।

প্রথম প্রকাশ ঃ
জানুয়ারি ১৯৬০

প্রকাশক ঃ
ভোলানাথ দাস
সপ্তর্ষি
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক ঃ
কনক কুমার বসুঠাকুর
সুমুদ্রণী
৪/৫৬-এ, বিজয়গড়,
কলিকাতা-৭০০০৩২



যখনি এ-ছবিটা আমার চোখের সামনে তুলে ধরি, তখনি আমার মন চ'লে যায় বহু অতীতের এক গ্রাম্য পরিবেশে। এটা প্রায় চল্লিশ বছর আগের কথা। কিন্তু আজো মনে হয় যেন আমি উপস্থিত হয়েছি গৌহাটী থেকে প্রায় পনেরো মাইল দূরের সেই শান্ত নিবিড় পল্লীগ্রামে। সেখানে জনমানব খুব তেমন নেই, আছে সামান্য কিছু নিরীহ সরল প্রকৃতির কাছারী লোকের বসতি। সেখানকার পরিবেশে প্রকৃতি আর জনমানব পৃথক সত্তায় ধরা দেয় না। মনে হয়, সবকিছু মিলেমিশে যেন একটি মাত্র পরিবেশ—শান্ত, স্নিগ্ধ, মধুর! দেখা যায়

কিছু দূরেই একটি পাহাড়, আর সেখান থেকেই ছুটে আসা ছোট্ট একটি ঝরণার ধারা সেই গ্রামের বুক বেয়ে চলেছে অবিরাম। ঝরণার কুলু-কুলু রব যেন গ্রামেরই বুকের স্পন্দন।

শহরের চিরন্তন কোলাহলের একঘেয়েমি ঘোচাতে একদিন আমাকে যেতে হয়েছিলো এক জমিদার বন্ধুর সঙ্গে দূরের সেই পল্লীগ্রামে। বন্ধুকে মাঝে মাঝে যেতে হ'তো সেখানে। সেই সুবাদেই একদিন সঙ্গী হয়েছিলাম আমি। বন্ধুর উদ্দেশ্য খাজনা আদায় করা, কিন্তু আমার আশা ছিলো ছ'-একটি গ্রামের ছবি তোলা। সঙ্গে ক্যামেরা ছিলো।

সেই গ্রামেরই ছোট্ট একটি খড়ের ঘর। তারই ভেতর এক দিকে টেবিল-চেয়ারে খাতাপত্র নিয়ে বন্ধু বসেছে। পাশেই একটি চেয়ারে আমি। বাইরে কিছু লোক অপেক্ষায় আছে, নাম ডাকলেই ভেতরে আসবে। তখন জমিদার আর প্রজার বোঝাপড়া হবে। আদায় হবে প্রাপ্য খাজনা। বকেয়া যদি কিছু থাকে, তবে অন্তত প্রতিশ্রুতি আদায় করা হবে। আর যদি হুজুরের তেমন মর্জি হয়, তা হ'লে বকেয়া-খাজনা মকুব হ'তে পারে।

সে যেন একটি ছোটখাটো আদালত। কিন্তু আমি তো ওখানে খাপছাড়া। আমি কি ওদের দেনা-পাওনার ব্যাপারে সাক্ষী হ'তে গিয়েছি? তার থেকে বরং বাইরে এদিক-ওদিক ঘুরে এলে ছ'-একটা ছবি হ'য়ে যেতে পারে, এই ভেবে চ'লে এলাম ঘর থেকে।

বাইরে এসে বন্ধুর প্রজাদের দেখছি, তখনই নজরে এলো এই বৃদ্ধা নীরবে এক প্রান্তে ব'সে আছে নাম ডাকার অপেক্ষায়। আমি এগিয়ে গেলাম তার কাছে। প্রথমে ছ'-একটা কথা বলার ছলে লক্ষ্য করলাম বৃদ্ধার মুখখানা। ধীর স্থির এই বৃদ্ধার বহুরেখাঙ্কিত মুখখানা অপূর্ব সুন্দর লাগলো। বার্ধক্যের সৌন্দর্য। স্বভাবতই আমার ইচ্ছে হ'লো ঐ মুখের একটা ছবি তুলতে। ছবি তোলার কোনো অসুবিধাই ছিলো না। মুখের কথাই যথেষ্ট জেনে পাশের লোকদের জানালাম

আমার ইচ্ছেটা। ওরাও সঙ্গে সঙ্গেই বৃদ্ধাকে এনে বসালো আমার নির্দিষ্ট স্থানে। লোকগুলো নিশ্চয়ই ভেবেছিলো, বৃদ্ধার ভাগ্য ভালো জমিদারের লোক ছবি তুলছে। কিন্তু বৃদ্ধা যে অন্য কিছু একটা ভেবেছে, তা আমি আঁচ করতে পারলাম ওর মুখের ভাব দেখে। হয়তো বৃদ্ধা ভেবেছে, এটাও জমিদারের হুকুম মতোই হচ্ছে। যাই হোক, ছবিটা তুলে আত্মতৃপ্তি নিয়ে একটু ঘুরে এলাম এদিক-ওদিক।

আবার ঘরের ভেতরে এসে বসলাম। ঘরে-বাইরে তখন প্রায় ফাঁকা হ'য়ে এসেছে। মাত্র জনাকয়েক হয়তো বাকী, ঠিক সেই সময় বৃদ্ধা ধীরে ধীরে এসে টেবিলের ওপর কিছু টাকাকড়ি রেখে করজোড়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

দীর্ঘদিনের পরিচিতা বৃদ্ধাকে দেখে বন্ধু খুশী মনে বললো—'বুড়ি-মাই এসেছো? ভালো আছো তো?'

কিন্তু হঠাৎ এ কি কাণ্ড! বৃদ্ধা কাঁপতে কাঁপতে প্রায় মাটিতে ব'সে পড়েই কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলতে লাগলো—'বাবু আমার আগের খাজনা তো অল্পই বাকী আছে। কিন্তু এবার অনেক চেষ্টা ক'রেও সব টাকা জোগাড় করতে পারিনি। আমি যেমন করেই পারি পরের কিস্তিতে সব মিটিয়ে দেবো। তুমি আমাকে নোটিস্ দিও না—আমি আর……।'

বৃদ্ধার কথা বন্ধ হ'য়ে গেলো। বন্ধু তো অবাক! ব্যাপার কী? তখন ওর লোকেরা জানালো যে, ঐ ছবি তোলার পর থেকেই বৃদ্ধা ঘাবড়ে গেছে। ও ভেবেছে, খাজনা বাকীর জন্য ছবি তুলে নেওয়া হয়েছে। এবার নোটিস্ আসবে হয়তো। ব্যাপারটা তখন বুঝতে পেরে আমরা সবাই খুব হাসলাম এক চোট।

বন্ধু তখন বৃদ্ধার হাত ধ'রে তুলে দাঁড় করালো। তাকে বললো—'তোমার কোনো ভয় নেই বুড়ি মাই, আমি তোমার বকেয়া খাজনা মকুব ক'রে দিলাম। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, আমি নোটিস্ দেবো না।'

এতোভাবে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বন্ধু বৃদ্ধাকে বিদায় দিলো ঠিকই, কিন্তু

আমি লক্ষ্য করেছিলাম, ওর মুখ থেকে তখনো আশঙ্কার ছাপ মুছে যায় নি। স্বভাবতই আমার মনে তখন খারাপ লেগেছিলো, কারণ ওর এই অশান্তির নিমিত্ত আমিই।

আমার তোলা বহু ভালো ছবির ভেতর এই ছবিটা বিশেষ একটি স্থানের অধিকারী। কারণ এটা শুধু এদেশেই নয়, বিদেশে পর্যন্ত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। কিন্তু আজ ছবিখানা হাতে নিলে ছবির মর্যাদা ছাপিয়ে আমার মনে জাগে বেশী বৃদ্ধার সেই কাতর মিনতির কথা। তখন আমি ব্যর্থ হই ছবির গুণাগুণ কিংবা একটি মুখাবয়বের রূপ-সৌন্দর্য বিচার করতে। আমি যেন দেখতে পাই তার মুখে ভয় ও আশঙ্কার ছাপ। তখন ভাবি, জমিদারের নোটিস্ থেকে বুড়িমাই মুক্তি পেতে কবে ভগবানের নোটিস্ হাতে তুলে নিয়েছে কে জানে!



আজ কতো মধুর স্মৃতি বহন ক'রে থাকতে পারতো এই ছবিটি। কিন্তু তা পারেনি বিধাতার এক নিষ্ঠুর পরিহাসে। তাই আজ এ-ছবি এক মর্মান্তিক ঘটনার স্মৃতিকেই জাগিয়ে তোলে শুধু। ছবিটা দেখলেই স্মৃতির দর্পণে স্পষ্ট ভেসে ওঠে আলিপুরের চিড়িয়াখানার সেই ছোটদের অতিপ্রিয় হস্তিনী 'ফুলমালা' আর তারই প্রিয় মাহুত বন্ধু 'ফরমান মিঞা'র কথা। আজো ব্যথিত চিত্তে বহুজন স্মরণ করবেন এদের দু'জনের কথা। বিশেষ ক'রে যাঁরা ছোটদের চিড়িয়াখানা দেখাতে নিয়ে গিয়ে এদের সংস্পর্শে এসেছিলেন।

প্রায় বছর পনেরো হ'য়ে গেছে—তখন ছোটরা দৌড়ে ছুটে যেতো ঐ ফুলমালার ঘরের কাছে। আর ফুলমালাও তেমনি ঠিক ওদের মনের কথা বুঝতে পেরে নানাভাবে খুশীর-ভাব প্রকাশ করতো। শুঁড় তুলে নানাভাবে দোলা দিতো। তখন বাচ্চাদের আনন্দ আর যেন ধরতো না। এমন কি বড়রা পর্যন্ত খুশী হ'তো। ওদিকে ফরমান মিঞা এসে দাঁড়াতো ছোটদের কাছে। বৃদ্ধ ফরমানের মুখে ফুটে উঠতো স্নেহমাখা হাসি। তখন চিড়িয়াখানার ঐ স্থানটুকুতে যেন হাসি-খুশীর ফুল ফুটতো। আর ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরাও বসিয়ে দিতো আনন্দের মেলা।

চিড়িয়াখানায় ছোটরা সবাই সিংহ, বাঘ, শিম্পাঞ্জী, বাঁদর, হরিণ —এসব দেখে আনন্দ-কৌতুক উপভোগ করে। তবে এটা ঠিক যে, ছোটদের মনে বাঘ-সিংহের ভয়াবহ রূপটি তেমন পছন্দসই লাগেনা। অথচ এমনি মজা যে, ঐ বিরাট আকৃতির হাতীটাকে দেখে তেমন ভয় পেতোনা কোনো শিশুই। কেন জানি ওরা বুঝতে পারতো ঐ হাতীর প্রাণেও স্নেহ-মমতা আছে। সেটা বেশী ক'রে প্রমাণ করেছিলো এই ফুলমালাই।

সে-সময় শীতের এক সকালে আমি চিড়িয়াখানায় ঘুরে বেড়াচ্ছি ছেলের হাত ধ'রে। প্রথমেই হরিণ-বাঁদর-শিম্পাঞ্জী এসব দেখা হ'য়ে গেছে। এক সময় ছেলের হাতের টানে বুঝতে পারলাম ওর মন টানছে কোথায়।· স্বভাবতই ফুলমালার ঘরের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। তখন ফুলমালার পায়ে শেকল বাঁধা, তবুও চেষ্টা করছে এগিয়ে পিছিয়ে চলার ভাব প্রকাশ করতে! তাই দেখে ছেলে তো মহাখুশী!

ওদিকে ফরমান মিঞা কি যেন একটু কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলো। ছুটে এলো আমার কাছে। খুব আগ্রহে হাত বাড়িয়ে বললো—'দিন, খোকাকে একটু চাপিয়ে একটা চক্কর দিয়ে আনি।'

নিয়ে গেলো ছেলেকে ফুলমালার কাছে। ফুলমালা তখন শুঁড়টা

লম্বা ক'রে খোকার দিকে বাড়িয়ে দিচ্ছে, আর পা নাড়ছে। খোকা একটু আনন্দমিশ্রিত ভয়ে পেছিয়ে দাঁড়ালো। ফরমান বললো—'ভয় নেই কিচ্ছু, ও তোমাকে খুব চেনে। দেখবে তোমাকে পিঠে নিয়ে বেড়াবে।' ফরমান ছুটে গিয়ে এক টুকরো আখ্ নিয়ে এলো। খোকার হাতে দিয়ে বললো—'এটা ওকে দাও, দেখবে তোমাকে কতো আদর করবে। ও আখ্ খুব ভালোবাসে কিনা!' ফরমানের কথা শেষ না হতেই ফুলমালা শুঁড় বাড়িয়ে আখ্‌টি নিয়ে নিলো খোকার হাত থেকেই। দেখলাম ভয়-সঙ্কোচের ভেতরও খোকার সে কী আনন্দ! ফরমান এবার খোকার বন্ধুর মতো হাত ধ'রে ফুলমালাকে বসতে বললো। ফুলমালা কী সুন্দর সঙ্গে সঙ্গেই বসলো। দু'জনেই পিঠে চেপে বসার পর ফরমানের হুকুম মাফিক এক চক্কর ঘুরে ফুলমালা এসে দাঁড়ালো আবার।

ফুলমালা, ফরমান আর খোকা—এদের তিনজনের এই ব্যাপারটা বড়ই মধুর মনে হ'লো। ওদের তিনজনের বন্ধুত্বের স্মৃতির নিদর্শন হিসেবে তুলেছিলাম এই ছবি। মনে আছে, ছবি তুলবার সময় ফরমান কী আগ্রহ নিয়েই না দাঁড়িয়েছিলো ফুলমালা আর খোকার পাশে গিয়ে। ফরমান ফুলমালাকে 'সেলাম' জানাতে বললো। অমনি শুঁড় তুলে দিলো ফুলমালা। তোলা হ'লো তিনজনের একটা গ্রুপ-ছবি।

যে স্মৃতিকে ধ'রে রাখবো ব'লে এই ছবিটি তুলেছিলাম, তা ব্যর্থ ক'রে দিয়ে আজ তুলে ধরে বিষাদমাখা এক করুণ স্মৃতি। ছবি ঠিক একই আছে, কিন্তু কালের নিষ্ঠুর পরিহাসে পালটে গেছে তার অর্থ। আলিপুর চিড়িয়াখানার দুটি প্রাণী—ফরমান আর ফুলমালা—একই কাজে বহুদিন লিপ্ত থেকে মনের বোঝা-পড়ায় মানুষ আর পশুর পার্থক্য ঘুচিয়েছিলো। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা তা ছিলো না। তাই হয়তো মনের ভুল বোঝাবুঝি শুরু হ'লো এবং সেই মন কষাকষি চরম পর্যায়ে যেদিন পৌঁছলো, সেদিনই ফুলমালা রেগে গিয়ে তার প্রিয় সঙ্গী ফরমানকে শুঁড় দিয়ে পেঁচিয়ে ধ'রে আছড়ে-আছড়ে মেরেই ফেললো।

সাথীহারা ফুলমালা তার ঘরের কাছে এসে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো বহুক্ষণ। মনে হ'লো, তার মনেও অনুশোচনা জেগেছে মানুষের মতোই। তারপর কি জানি কেন, হঠাৎ উদভ্রান্ত হ'লো ফুলমালা। সবাই ভয় পেয়ে গেলো। বিপদের আশঙ্কা ক'রে পরদিন ফুলমালাকে মেরেই ফেলা হ'লো গুলী ক'রে।

মুছে গেলো চিরতরে ফুলমালা আর ফরমান মিঞা। কিন্তু এই বিয়োগান্ত কাহিনীব মধ্যে একটা কথাই প্রমাণিত হ'য়ে বইলো যে, প্রাণের বদলে প্রাণ নিতে পশু আব মানুষে পার্থক্য নেই।



রাজস্থানের এই কিষাণ-বউটির খুব সাধ ছিলো, এ রকম সজ্জিত-বেশে তোলা একটি ফটোগ্রাফ ওর ঘরে থাকবে। তার অনুরোধেই আমি তুলেছিলাম এই ছবি। কিন্তু ছবি তোলার পর থেকেই একটি প্রত্যাশা নিয়ে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কাটিয়ে কিষাণ-বধূটির মনে অবশেষে এক সময় নিশ্চয়ই নিরাশার অন্ধকার নেমে এসেছিলো। দীর্ঘ কুড়ি বছর পরেও যদি আকাঙ্ক্ষিত সেই ফটোগ্রাফ দেখতে না পায়, তা হ'লে বিষয়টি বোধ করি প্রবঞ্চনার আওতায় পড়ে। এবং এই অপরাধের জন্য নিশ্চয়ই ফটোগ্রাফারকে দায়ী করা চলে। তবে, অপরাধ স্বেচ্ছাকৃত নয়, একথা প্রমাণ করতে পারলে বিচারে হয়তো অপরাধের গুরুত্ব লাঘব হ'তে পারে। কিন্তু তাতে অপরাধ পুরোপুরি খণ্ডাবে কি ?

এখানে আমি অপরাধী। কারণ আমি সেদিন ওদের ঠিকানা না নিয়েই চ'লে এসেছি। খেয়াল হয়নি মোটেই।

ফটোগ্রাফাররা কোথাও বেড়াতে গেলে বিস্তর ছবি তোলেন পথে-

ঘাটে নানা জনের। কতো অচেনা মুখের ছবি তোলা হয়। তাই ব'লে কি সকলের ছবির কপি পাঠিয়ে দেওয়া হয়? তেমন প্রয়োজন বা স্বার্থ না থাকলে পাঠায় না। ফটোগ্রাফার তার নিজের প্রয়োজনেই ছবি তোলেন, তাই অচেনারা ছবি পাবার প্রত্যাশাও করে না কোনো দিন। কিন্তু আমার এ-ব্যাপারটি তো তা নয়! এখানে ছবি পাঠানো হবে এ-রকম একটা কথা দেওয়া ছিলো। কিন্তু···

সেবার আজমীর শহরে বেড়াতে গিয়ে ইচ্ছে হয়েছিলো একটু গ্রাম্য পরিবেশে বেড়াতে যেতে এবং সেখানকার দেহাতী লোকজনদের কিছু ছবি তুলে আনতে। সেই মতলবে একদিন সকালে চ'লে গেলাম শহর থেকে কিছুদূরে দক্ষিণপ্রান্তে। রাজপথের ডান দিকে একটি গ্রামের সন্ধান পেয়ে, গিয়ে হাজির হলাম বসতি এলাকায়। অদূরে জমিতে চাষ দিচ্ছিলো এক কিষাণ, তারই সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ পেলাম। আমার ছবি তোলার মতলবের কথা জানাতেই সে আমাকে সোজা তার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে হাজির করলো। আলাপ করিয়ে দিলো তার বৃদ্ধা মাতার সঙ্গে। ভাবে-সাবে আর চেহারা দেখে বুঝে নিলাম ঐ সংসারের সর্বে-সর্বা হচ্ছে ঐ বুড়িমা। সুতরাং প্রথমেই বুড়িমার ছবি তুলে শুভ মহরৎ পালন করলাম। বাড়ীর ছেলে-পেলেরা এসে আমাকে প্রায় ঘিরে ধরলো। তখন ওদের জন্যও একটা ছবি বরাদ্দ করা হ'লো। ছোটদের হাসিখুশী ভাব দেখে বুড়ির মুখেও খুশীর ভাব দেখতে পেলাম। ইতিমধ্যে দেখতে পেয়েছিলাম বাড়ীর বউরা রঙচঙে পোশাকে বাইরের ইদারা থেকে জল আনছে। দেখতে ভারী সুন্দর লাগছে, তিন-চারজন বউ মাথায় জলের ঘড়া নিয়ে যাওয়া আসা করছে।

আমার মন মানলো না। বুড়িমাকে বউদের ছবি তোলার অভিপ্রায় জানালাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই 'নেহি নেহি' ব'লে ঘোরতর আপত্তি জানালো কিষাণ শাশুড়ী।

প্রশ্ন করলাম—'কেন বুড়িমা আপত্তি কিসের ?'

—'তুমি যে আমার বউদের মুখ দেখে ফেলবে ! ছিঃ ছিঃ বাইরের লোক—ও হবে না।' শাশুড়ীর মেজাজ বিগড়ে গেলো।

এবার আমি একটু হেসে ফেললাম। বুড়িমার একটু কাছে গিয়ে খুব নরম সুরে বোঝালাম—'আমি তোমার বউদের মুখ দেখবো না, ওদের ছবি আমার বউকে দেখাবো।'

আমার বউয়ের কথা বলা মাত্রই আশ্চর্যভাবে লক্ষ্য করলাম বুড়িমার মুখের ভাব পরিবর্তন। আমার মুখের দিকে চুপ ক'রে তাকিয়ে রইলো। বৃদ্ধার মুখের ভাব পরিবর্তিত হ'লো এক স্নেহ-মমতাময়ী মাতারূপে। আমার মুখে আর কোনো কথা এলো না তখন।

একটু পরেই স্নেহমাখা প্রশ্ন এলো—'ঘরে তোমার বউ আছে ?'

—'হ্যাঁ, তোমার বউদের মতোই দেখতে। দেশে ফিরে তোমাদের কথা বলবো, আর এই ছবি দেখাবো।'

—'আচ্ছা একটু দাঁড়াও।' বলেই উৎফুল্লভাবে বুড়ি ছুটলো বাড়ির ভেতর মহলে।

আমি বাইরে থেকেই বুঝতে পারছিলাম বিপদের মেঘ কেটে গেছে, আবহাওয়া ক্রমশ ভালো হচ্ছে। অনুমান করতে অসুবিধা হ'লো না যে অন্দর মহলের ভেতরে একটা আনন্দের দমকা হাওয়া বইছে।

কিছু পরেই প্রায় ছুটে এসে হাজির হ'লো তিন বউ আমারই কাছে। আশ্চর্য লাগলো ওদের সঙ্কোচহীন হাসিখুশী ভাব দেখে। আমি তো অনেকটা অপ্রস্তুত ব'নে গেছি—অবগুণ্ঠনহীন বধূরা আমার এতো কাছে এসে দাঁড়িয়েছে ব'লে।

পেছন থেকে শাশুড়ী আবার এসে হাজির হতেই বউরা মাথায় লম্বা ঘোম্‌টা টেনে দিলো। শাশুড়ীর সামনে ছবি তুলতে সঙ্কোচ আসবেই। কিন্তু ঘোমটা টেনে ছবি হবে কি ক'রে ? এক নতুন সমস্যা হ'লো। তখন এক বউ তার শাশুড়ীকে বুঝিয়ে বলতেই বৃদ্ধা নিজেই দূরে স'রে গিয়ে দাঁড়ালো।

সেদিন ছবি তোলায় শাশুড়ীর অনুমোদনে বউরা যেন আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে পড়েছিলো। আশ্চর্য হ'য়ে আমি তখন লক্ষ্য করছিলাম—এই লজ্জাশীলা দেহাতী বধূরা কতো সহজভাবে কথা বলছে আমার সঙ্গে। দূরকে নিকট বন্ধু করার মতোই তখন আপন ক'রে নিয়েছে পরদেশী এক অজ্ঞাতকুলশীলকে। শাশুড়ী হয়েছে পর।

এই সময় একটি বউ আমার খুব কাছে এগিয়ে এসে বলেছিলো—'বাবুজী, আমার সব গয়নাগাটি প'রে একটা ছবি তুলে দেবে? আমার খুব শখ বহুদিন ধ'রে। আমাদের ছবি তো কেউ তোলেনি কোনোদিন, তা তুমি যদি একটা তুলে দাও তা হ'লে নিজের চেহারা ছবিতে দেখবো। তুমি দেবে?'

এরকম সহজ, সরল, স্পষ্ট অনুরোধ উপেক্ষা করবার ক্ষমতা আমার ছিলো না। খুশীমনেই সম্মতি জানালাম আমি। আর তখুনি বউটি ছুটে গেলো ঘরের ভেতর। ফিরে এলে দেখলাম তার গলায়, হাতে, নাকে-কানে সর্বত্র রকমারী রূপোর গয়না। মুখে একটা গর্বমিশ্রিত আনন্দের ছাপ।

*

বউটির আকাঙ্ক্ষিত ছবি তোলা হ'লো। আরও তোলা হ'লো কয়েকটা অন্যদের ছবি। তখন আমি ওদের পরিবেশে স্বাভাবিক অনুভব করছি, বিশেষ ক'রে বৃদ্ধার স্নেহের স্পর্শ পেয়ে। ছবি তোলার আত্মতৃপ্তি আর কিষাণ পরিবারের আন্তরিকতায় তখন এতো বেশী অভিভূত ছিলাম যে, ওদের কাছ থেকে বিদায় নেবার কালে আমার মনে একথা একবারও উদয় হয়নি—কীভাবে এদের ছবি আমি পৌঁছে দেবো? তাই, আমার এই গাফিলতির জন্য সেদিনকার আত্মতৃপ্তিতে আজ বিষাদ টেনে আনে। বিশেষ ক'রে অনুশোচনা জাগে ঐ সরল কিষাণ রমণীকে একটি বিশেষ আশা থেকে বঞ্চিত করেছি ব'লে।



ছবিতে দেখা যাচ্ছে, মুসলীম নেতা মহম্মদ আলি জিন্না সদর দরজা দিয়ে এগিয়ে আসছেন। আমি তখন বসেছিলাম বাইরে—একটি গাড়ির ভেতরে। তিনি আমারই কাছে আসছেন জানতে পেরে আমি গাড়ী থেকে নেমে দাঁড়ালাম। কিন্তু কেন তিনি আসছেন তা জানবার আগেই এই ছবিটি তুলে ফেলেছি।

পাকিস্তান তখন সকলের মুখে মুখে। ভারতবর্ষের বুকের উপর আঁচড় কেটে বিভক্ত দুই দেশের চৌহদ্দির পূর্ণ বিবরণ লেখা হয়নি। কবালা রেজিস্ট্রি করা হয়নি ব্রিটিশের আদালতে। বোধ করি এই সংক্রান্ত ব্যাপারেই মুসলীম লীগের নেতা মহম্মদ আলি জিন্না তখন দিল্লিতে খুব ব্যস্ত। এই সময় একদিন তাঁর বাংলোতে আমাকে যেতে হয়েছিলো 'ডন্' পত্রিকার সম্পাদক আলতাফ্ হোসেনের সঙ্গে।

আলতাফ্ হোসেন আমার শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন এবং তিনি ছিলেন আমার গুণগ্রাহী। তাঁরই একটি ছোট্ট অনুরোধ ছিলো মহম্মদ আলি জিন্নার কয়েকটি ছবি তুলে দেওয়ার। তাঁর কাছে নাকি ভালো ছবি ছিলো না। এহেন একজন বিশিষ্ট নেতার ছবি তোলার সুযোগ পেলে যে-কোনো ফটোগ্রাফারই নিজেকে ভাগ্যবান মনে করবেন। আমিও সেদিন তাই মনে করেছিলাম।

তখন বোধ করি বৎসর শেষ হ'তে আর দু'-একটা দিন অবশিষ্ট আছে। কী প্রচণ্ড শীত তখন দিল্লিতে! তবুও এই হাড়কাঁপুনি শীতের সাত সকালে নিজেকে প্রস্তুত করতে হয়েছে এই লোভনীয় কাজটির জন্য। পূর্বদিনের কথামতো আমরা মিস্টার জিন্নার বাংলোয় যখন হাজির হলাম, তখন তাঁর ব্রেক্ফাস্ট শেষ হয় নি। অগত্যা আমাদের বসতে হ'লো। বেশীক্ষণ নয়, কিছু পরেই তিনি এসে উপস্থিত হলেন। নিখুঁত পরিপাটি বেশ, হাতে পাইপ। হাত মিলিয়ে সৌজন্য বিনিময় হ'লো। আলতাফ্ সাহেব আমাকে যথারীতি পরিচয় করিয়ে দিলেন তাঁর সঙ্গে।

মনে হয়, আলতাফ্ সাহেব আমার সম্বন্ধে একটু অতিরিক্ত ব'লে ফেলেছিলেন। আর সেজন্যই হয়তো মিস্টার জিন্না সরাসরি ছবি তোলার কথা না ব'লে, বলতে লাগলেন অন্য ধরনের কিছু কথা। সেটা একটু আলোচনা গোছের। অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি তিনি, কথার ফাঁকে একবার আমার পুরনো মামুলী ক্যামেরা আর সরঞ্জামের দিকে লক্ষ্য করেই নিরাশ হলেন ব'লে মনে হ'লো। দেখলাম আমার অনুমান

মিথ্যা হয় নি। তিনি ঠিক ক্যামেরার প্রসঙ্গই তুললেন—'ওয়েল, বিদেশের বহু ফটোগ্রাফার আমার কাছে এসেছে, তাঁদের কাছে দেখেছি কতো রকমারি ক্যামেরা আর সরঞ্জাম। কিন্তু আমাদের দেশে?' এ-বিষয়ে আর বেশী কিছু না বলেই নীরব হলেন। অন্য দেশের সঙ্গে তুলনা ক'রে তিনি বোধ হয় নিজের দেশের ভবিষ্যৎ খুঁজে পেলেন না।

আমিও নীরবে ব'সে আছি। বলবার কিছুই নেই।

ফায়ার-প্লেসের সামনের সোফাটায় মিস্টার জিন্না বসেছিলেন আধ-বসা ঢঙে। হাতে নিভে-যাওয়া পাইপটা একটু খুঁচিয়ে নিয়ে আবার ধরালেন। একবার ঘড়িটার দিকে তাকিয়েই আমাকে বললেন—'ওয়েল, আমি আর বেশীক্ষণ থাকতে পারবো না। ভাইস্‌রয়ের সঙ্গে আমার একটা অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে একটু পরেই। তা—তুমি যদি কাজটা সেরে নাও—বলো আমাকে কোথায় কিভাবে বসতে হবে।'

ক্যামেরা হাতে আমি উঠে দাঁড়ালাম। তাকালাম আলতাফ্ সাহেবের দিকে। তিনিই তো বলবেন ছবি তোলার কথা।

প্রয়োজনমতো কয়েকটা ছবি তোলা হ'লো। আলতাফ্ সাহেব এবার বললেন—'আপনি একটু গাড়িতে বসুন গিয়ে। আমি এক্ষুনি আসছি ওঁর সঙ্গে দু'-একটা দরকারী কথা ব'লে।' আমি চ'লে এলাম।

গাড়িতে ব'সে ছবি তোলার কথা স্মরণ ক'রে আনন্দ আর আত্ম-তৃপ্তিতে ধূমপান করছি, হঠাৎ দেখি সদর দরজা দিয়ে আলতাফ্ সাহেব ছুটে আসছেন। অতি ত্রাস্তভাবে তিনি ঘন ঘন হাত নেড়ে ডাকছেন আমাকেই। তখনি দেখলাম মিস্টার জিন্নাও আসছেন তাঁর পেছনে পেছনে।

সে কি—আবার কেন? আরও ছবি? তখন কিছুই মাথায় এলো না আমার। তবুও গাড়ি থেকে নেমেই নিমেষে তাঁর এই ছবিটি তুলে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি।

মিস্টার জিন্না সিঁড়ি দিয়ে টক্ টক্ ক'রে নেমে এলেন। তারপরে সরাসরি এগিয়ে এলেন আমার সামনে। এসেই হাতখানা বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে। আমার হাতখানা ধ'রে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বললেন—'আমি তো তোমাকে 'গুড্‌বাই' জানাই নি! ধন্যবাদ দেওয়া হয়নি!'

*

আমাকে বিদায় জানাতে মহম্মদ আলি জিন্না স্বয়ং বাইরে এসে যখন হাত বাড়িয়েছিলেন, তখন আমার হাত কতটুকু উঠেছিলো এবং আমি আমার কৃতজ্ঞতা কিভাবে প্রকাশ করতে পেরেছিলাম তা আজ আমার স্মরণ নেই। শুধু এটুকু স্মরণ আছে, তাঁর এই সৌজন্য প্রকাশে মুগ্ধ হ'য়ে তখন অনুভব করেছিলাম—ওভাবে বিদায় জানিয়ে তিনি যেন আমাকে কাছেই টেনে নিলেন। তাই আজও সেদিনের কথা স্মরণ ক'রে খুঁজে পাই সেই চিরন্তন সত্য কথাটি—"সৌজন্য প্রকাশে কিছুই ব্যয় হয় না।"



অবনীন্দ্রনাথকে আমার একবারই দেখার সুযোগ হয়েছিলো। বরং সৌভাগ্য হয়েছিলো বলাই উচিত। সুতরাং তাঁর ছবি তুলবার সুযোগ পেয়েছি ঐ একবারই। কিন্তু হায়! সে-ছবিও স্বাভাবিক-ভাবে গ্রহণযোগ্য হয়নি। সেগুলো শুধু আমার ব্যক্তিগত খাতে রেখে দিয়ে মনকে সান্ত্বনা দেওয়া চলে। আর চলে এই হিমালয়তুল্য শিল্পী-মহানের সন্দর্শনে একটি দিনের কাহিনী স্মরণ করতে।

হিমালয় তার মহান রূপ-ঐশ্বর্য দেখাতে কোথাও যায় না, তার রূপদর্শন মানসে সারা বিশ্বের গুণগ্রাহীরা ছুটে আসেন। দেখে নয়ন-

মন সার্থক ক'রে ফিরে যান। তেমনি মহান শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ বিশ্ববিশ্রুত হ'য়েও নিজে কোথাও যাননি। অতি সতর্কতায় নিজেকে লুকিয়ে রেখে ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকতেন তিনি শিল্প-চর্চায়। সারাদিন, সারাক্ষণ, বছরের পর বছর। কিন্তু প্রতিভাকে লুকিয়ে রাখা যায় না ব'লেই রস-সন্ধানী চিত্রশিল্পীরা ছুটে এসেছেন দেশ-বিদেশ থেকে তাঁরই রঙ-তুলির খেলা দেখতে। স্বচক্ষে দেখে তাঁরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার ক'রে গেছেন—প্রাচ্যের চিত্রকলায় এই নতুনত্বের ধারা নিঃসন্দেহে অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভায় সমৃদ্ধ। যাঁর কল্যাণে ভারতবর্ষ এতোখানি স্বীকৃতি পেলো, এতোখানি সমাদর পেলো—তিনি কিন্তু নিজেকে লুকিয়ে রাখতে সর্বদাই ব্যস্ত। বেশির ভাগ সময়ই তিনি ছবি নিয়ে মগ্ন থাকতেন বরাহনগরের এক প্রান্তে 'গুপ্ত-নিবাসে'। জানি না, ওটা তাঁর লুকিয়ে থাকার স্থান ছিলো ব'লেই নাম গুপ্ত-নিবাস হয়েছিলো কিনা। তবে এটুকু জানতাম যে, নেহাত তেমন প্রয়োজন না হ'লে শান্তি-নিকেতনে পর্যন্ত বেশী দিন থাকতে চাইতেন না তিনি।

আমরা চার বন্ধু'তে ১৩৫২ সালে শেষ-পৌষের একটি দিনে হাজির হয়েছি অবনীন্দ্রনাথ-দর্শন মানসে। বরাহনগর যাবার পথে সেদিন আমার অনেকখানি মনে হয়েছিলো দেব-দর্শনের কথা। জানি না, মানুষকে দেবতার সামিল করলে দেবতারা রুষ্ট হন কিনা। হয়তো সে-জন্যই সেখানে পৌঁছে শুনলাম—অবনীন্দ্রনাথ অসুস্থ, লোকের সঙ্গে দেখা করা ডাক্তারের বারণ, এখন ঘুমিয়ে আছেন—ইত্যাদি। পিতার এই অসুস্থতার কথা জানিয়ে অলক ঠাকুর আমাদের অবস্থাটাও একবার একটু ভেবে দেখলেন যেন। বললেন—'একটু বসুন তো, দেখি।'

আমার বন্ধুদের মনের অবস্থা তখন কিরকম হয়েছিলো জানি না। তবে আমার তখন মনে পড়ছিলো—একবার তারকেশ্বরে দেব-দর্শন করতে গিয়ে মন্দিরের রুদ্ধ দ্বার থেকে ব্যর্থ চিত্তে ফিরে এসেছিলাম। তারপর ট্রেনে ক'রে ব্যাণ্ডেলে এসে সেখানকার বিখ্যাত গির্জা

দেখেছিলাম ঘুরে ঘুরে। অনেকক্ষণ ধ'রে। সেদিন দেব-দর্শনের ব্যর্থতা মনে কোনো আফসোস টেনে আনেনি। কিন্তু এদিন অবনীন্দ্রনাথের গৃহে ব'সে তাঁকে বিনা-দর্শনে চ'লে যেতে হবে ভাবতেই মনটা যেন মুষড়ে গেলো। বিষণ্ণ মনে ব'সে রইলাম নীরবে। হাতের ক্যামেরাটার দিকে একবার তাকিয়ে আমার বিষণ্ণতা যেন আরো গাঢ় হ'লো।

তখনি সবাইকে চমকে দিয়ে হঠাৎ দেখি ঘরের পর্দা সরিয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন অবনীন্দ্রনাথ। নিমেষেই মন থেকে মুছে গেলো পুঞ্জীভূত নিরাশা। সন্তুষ্টচিত্তে সবাই প্রণাম ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম।

কিছু নলেন-গুড়ের সন্দেশ আর একটি রজনীগন্ধার তোড়া সঙ্গে নিয়েছিলাম। সেগুলো টেবিলের ওপর রাখতেই ভৃত্যকে তিনি ওসব ভেতরে নিয়ে যেতে বললেন। একটু ইতস্তত ক'রে আবার বললেন —'সন্দেশটা ওদিকে রেখে যাও।' তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন—'ডাক্তারের বারণ আছে এ-সব খাওয়া। বউমা হয়তো দেবে না—তাই লুকিয়ে এখানেই দু-একটা খেয়ে নেবো।' শিশুর মতো কথাগুলো বলেই হাসতে লাগলেন অবনীন্দ্রনাথ। তিনি নিশ্চয়ই তখন ভুলে গেছেন তাঁর শরীর অসুস্থ।

আমরা বেশ কিছু সময় ছিলাম তাঁর সান্নিধ্যে। নানা কথায় তিনি মেতে উঠেছেন, তারই ভেতর এক ফাঁকে নিয়ে এলেন একটা 'কুটুম-কাটাম'। একটা কাঠবেড়াল। এতো সব মজার ব্যাপার দেখছি, কিন্তু আমি বন্ধুদের মতো তেমন উপভোগ করতে পারছি না। কারণ, আমার মনের ভেতর তখন জেগেছে একটি নিরাশার ব্যথা। স্পষ্ট বুঝলাম, আমার ক্যামেরার বরাত মন্দ।

তবুও জানালাম এক ফাঁকে অবনীন্দ্রনাথকে ছবি তোলার কথাটা।

তিনি নিজের গালে হাত বুলোতে-বুলোতে বললেন—'কিন্তু আমার যে অসুস্থ শরীর! আর দেখছো না একমুখ খোঁচা-খোঁচা দাড়ি?'

উত্তরে আমি বলি—'অসুস্থ শরীরের চেহারাই না-হয় আমি তুললাম!'

তিনি বুঝলেন, ছোড়া নাছোড়বান্দা। দাড়িতে আর একবার হাত বুলিয়ে অগত্যা রাজী হলেন—'আচ্ছা, তা হ'লে ল্যাঠা চুকিয়ে ফেলো। অস্ত্র যখন এনেছো, তখন বধ করেই ফেলো! বলো কোথায় বসবো?'

ছবি তোলার অনুমতি পেয়ে সেদিন নানাভাবে ছবি তুলতে কসুর করিনি। এমনকি তাঁর ভৃত্য যখন চা-খাবারের ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছিলো, তখনো ছবি তুলেছি।

সেদিন পৌষের অপরাহ্ণ বেলায় বরাহনগরের গুপ্ত-নিবাস ছেড়ে আসবার সময় আমার মনে যে আশা-নিরাশার একটা মিশ্রিত অনুভূতি জেগেছিলো, তা আজো মন থেকে মুছে যায়নি। সেদিন নিরাশার মুখে শিল্পী-গুরুর দর্শনলাভে সমর্থ হ'য়ে বিশেষ আনন্দ হয়েছিলো। কিন্তু ছবি তোলার সুযোগ পেয়ে, ছবি তুলেও, যা চেয়েছিলাম তা তো পেলাম না। তাঁর অসুস্থতা ছবিগুলোকেও যেন অসুস্থ ক'রে দিয়েছে।



ক্যামেরা মিথ্যা বলে না। এই বাক্যটি ক্যারেকটার-সার্টিফিকেটের মতোই সংশয়যুক্ত। কারণ, সৎ-চরিত্রের কথা নিশ্চিতভাবে না ব'লে, লিখতে হয় 'যতদূর জানি।' কিন্তু এ-ক্ষেত্রে আমি নিঃসংশয়ে বলছি যে, আমার ক্যামেরায় তোলা এই দুটি ছবি কিছুমাত্র মিথ্যা নয়। অভিজ্ঞতায় আরও বলছি, প্রকৃতিও অনেক সময় ক্যামেরা দেখলে মানুষের মতো বিচলিত হয়। ছবি তোলার আগ্রহে নিজেকে আকর্ষণীয় ক'রে তুলতে চেষ্টা করে। প্রকৃতি-চরিত্রের এই রূপটি যেভাবে আমার ক্যামেরার সম্মুখে বিকশিত হয়েছিলা তা স্মরণ করলে আজও বিস্ময়ে অভিভূত হ'তে হয়।

বছর কয়েক আগে, শ্রাবণ-বর্ষার এক বিকেলে আমি গিয়েছিলাম বারুইপুর এলাকার গ্রাম্য পরিবেশে। কলকাতার বাইরে দক্ষিণের এই অঞ্চলে সেদিন আমার একটু ব্যক্তিগত কাজ ছিলো। ছবি তোলার কোনো প্রয়োজন না থাকলেও ক্যামেরাটি ছিলো সঙ্গে। আমার

পরিচিত এক ভদ্রলোকের বাড়ির বিস্তৃত এলাকায় ঘুরে-ফিরে ক্ষণিকের জন্য ভুলে গিয়েছিলাম কলকাতার দমবন্ধ আবহাওয়ার কথা। ওখানে কতো রকমের গাছ-গাছড়া, আর কী সুন্দর একটি বড়ো পুকুর! তারই চারপাশে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নারকেল গাছ। পুকুরের পাকা ঘাটে বাড়ির একজন ছিপ ফেলে ঠায় ব'সে আছে ফাৎনার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। ভাবলাম একটু বসি ওখানে। মাছধরা দেখি।

কিছুক্ষণ ব'সে থেকে নিরাশ হলাম। ফাৎনাও স্থির, ভদ্রলোকও অচঞ্চল। একটিবারও নড়তে দেখলাম না। পুকুরের মাছ কি রকম ছিলো জানি না, তবে কাঁকড়া যে ছিলো না তা বুঝতে পারছিলাম অনড় ফাৎনাকে দেখে। না-হ'লে কাঁকড়া থাকলে ওভাবে ছিপ ফেলে আর ব'সে থাকতে হ'তো না। সঙ্গে সঙ্গেই ফাৎনাকে নাচিয়ে-নাচিয়ে টেনে নিয়ে যেতো জলের তলায়। মাছ মনে ক'রে খ্যাচ্ মারলেই দেখা যেতো কাঁটা-বড়শী নেই। যাই হোক, বিরক্ত বোধ হ'লো আমার। ভাবলাম এবার উঠি।

উঠে দাঁড়িয়ে ইচ্ছে হ'লো, সারিবাঁধা নারকেল গাছগুলোর একটা ছবি তুলি। গাছগুলো দেখতে মন্দ লাগছিলো না। ছবি একটা তুলে ক্যামেরা বন্ধ করলাম। এবার চলি। তবুও শেষবারের মতো ফাৎনার দিকে একবার দৃষ্টি দিলাম। বুঝলাম আশা নেই।

দৃষ্টি ফিরিয়ে উত্তর দিকে তাকিয়েই আমি থম্‌কে গেলাম। দেখি জমাটবাঁধা একটা ঘন কালো মেঘ উত্তর দিগন্ত থেকে ছুটে আসছে এই আকাশের দিকে। দেখতে দেখতে সেই কালিমা বিস্তৃতি লাভ করলো আকাশময়। চোখের নিমেষেই আমার মাথার ওপর আকাশটাতে কালো প্রলেপ দিয়ে চ'লে গেলো দক্ষিণমুখী। অন্ধকার হ'লো। মনে হ'লো আলো সব নিভে গেছে। সঙ্গেই সঙ্গেই ছুটে এলো এক দুরন্ত ঝড়। কী তীব্র গতি তার! সে যেন গাছপালা সব উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। চেষ্টা চলছে আমাকেও উড়িয়ে নেবার। আশু দুর্যোগের আশঙ্কায় সেই ভদ্রলোক তো ঘাটে ছিপ-টিপ ফেলে

রেখে ছুটে পালালেন। যাবার সময় চেঁচিয়ে আমাকে ব'লে গেলেন— 'শীগ্‌গির চ'লে যান—ঘরে চ'লে যান।'

কিন্তু আমি গেলাম না। তেমনি র'য়ে গেলাম পুকুর ঘাটে। শ্রাবণ-বর্ষার এমন একটি রূপসৌন্দর্য—নয়ন, মন আর দেহ দিয়ে উপভোগ করবার দুর্লভ সুযোগ পেয়ে আমি যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি ঐ পরিবেশে। মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে দেখছি আর ভাবছি— কী অপরূপ প্রকৃতির সাজ! কী সুন্দর তার আচরণ! ঝড়ের গতিছন্দে সেই নারকেল গাছগুলো পর্যন্ত হেলে-দুলে বর্ষার নৃত্য রচনা করছে। প্রকৃতির নবরূপ আমার সম্মুখে। এই তো ভরা-শ্রাবণের প্রকৃত রূপ! কিছু আগে তোলা ছবিতে তো প্রাণের এই সাড়া ছিলো না! এতখানি মুগ্ধ থেকেও আমি কালবিলম্ব না ক'রে আবার ছবি তুলে নিলাম— ঋতু-রূপের এই রচনার।

ছবি তুলবার সময়ই বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা ঝাঁক বেঁধে এসে গিয়েছিলো। ওরা যেন নেমে আসছিলো ঘনকালো আকাশের বুক চিরে। আমি তার শীতল স্পর্শ অনুভব করলাম সারা দেহে। প্রকৃতির তখন আর এক নতুন রূপ। সেদিন পুকুরঘাটে দাঁড়িয়ে থেকে প্রকৃতির এই রূপমাধুর্যে এতোই মুগ্ধ হয়েছিলাম যে, আমি খেয়ালই করিনি আমার দেহের সর্বাঙ্গ কখন ভিজে গেছে। সঙ্গে ক্যামেরাটিও।

*

এই ছবি দুটি পাশাপাশি রেখে আজ যখনই একটু মিলিয়ে দেখতে চেষ্টা করি, তখনই আমি যেন চ'লে যাই বারুইপুরের শ্রাবণ-বর্ষার সেই পরিবেশে। দেহে যেন অনুভব করি সেই বারিধারার শীতল স্পর্শ। কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে আমার মন এতোখানি মিলিয়েও আমি বুঝে উঠতে পারি না—প্রকৃতির সেদিন কেন এমন খেয়াল হয়েছিলো! ছবি তুলবার জন্যে কি?



ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় একটি জীপ গাড়ি থেকে নেমে আসছেন এই ছবিটি সেদিন ইচ্ছে করেই তুলে রেখেছিলাম একটা অতি মজার কাহিনী মনে রাখার উদ্দেশ্যে। ঠিক তাই, আজো দেখছি এই ছবি দেখলে মনে পড়ে সিকিমের সেই জীপ ড্রাইভারের আচরণের কথা। ড্রাইভার ভেবেছিলো ডাক্তার রায় একজন 'ফালতু আদমী'—আর তাই নিয়ে বেশ রগড় হয়েছিলো।

সেবার প্রধানমন্ত্রী নেহরু সিকিম পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর কন্যা এবং কৃষ্ণ মেনন। আর ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার রায়। সেদিন সকালবেলার প্রোগ্রাম ছিলো নাথু-লা অভিমুখে কিছু দূর যাওয়ার। সেই হিসেবে জীপের একটি কনভয় চলেছে তৎকালীন সিকিমের মহারাজকুমারের তদারকিতে। মাইল কয়েক অগ্রসর হ'য়ে এক জায়গায় বিরতি ঘটলো। শুনলাম এখানেই গাড়িগুলো থাকবে, অবশিষ্ট পথটুকু যেতে হবে ঘোড়ার পিঠে। দেখলাম ঘোড়ার ব্যবস্থাও প্রচুর রয়েছে।

যাই হোক, ঘোড়ায় চেপে প্রধানেরা অনেকেই চ'লে গেলেন। গেলেন না ডাক্তার রায়। কারণ তখন সবেমাত্র তিনি বিদেশ থেকে ফিরেছেন চোখ অপারেশন করিয়ে। সতর্কতায় চোখে কালো-চশমা রাখতে হচ্ছে সারাক্ষণ, চোখে না ঠাণ্ডা লাগে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী না-যাওয়াতে আমরাও কয়েকজন র'য়ে গেলাম। এই জীপ-বিরতির স্থানটি যে প্রায় বারো হাজার ফিট উঁচুতে তা উপলব্ধি করতে পারলাম ঠাণ্ডার মাত্রা অনুভব ক'রে। দারুণ কনকনে ঠাণ্ডা। ব'সে থাকলে আরো বেশী মনে হয়। তাই আমরা বাধ্য হয়েই একটু পায়চারি ক'রে, মুখে ধোঁয়া টেনে দেহের আভ্যন্তরীণ নালীগুলোকে চালু রাখবার চেষ্টা করছি। এতে যদি ঠাণ্ডার অনুভূতিটা লাঘব হয়।

ওদিকে কিছু দূরে ডাক্তার রায় জীপে ব'সে একটা বই পড়ছেন। ভাবলাম উনি একা ব'সে আছেন। যদি আমাদের কাছে পেয়ে কিছু ভালো লাগে। তাই আমরা এগিয়ে গেলাম। যেতেই তিনি বইটা বন্ধ ক'রে কথা শুরু করলেন। একথা থেকে সেকথা, তারপর কথা থেকে গল্প এলো। চললো একটার পর একটা। সত্যি কথা বলতে কি, বহুদিন ধ'রে ঘনিষ্ঠভাবে থেকে কঠিন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এই মানুষটিকে সেদিন যে রকম খুশ-মেজাজে দেখেছিলাম, তেমনটি আর কোথাও তাঁকে আমি দেখিনি।

আমরা দাঁড়িয়ে আছি জীপের পাশেই। তাঁর রসালো কথাগুলো

উপভোগ করছি, এমন সময় এক পাহাড়ী ছোকরা-ড্রাইভার এসে ওদিকে সীটে বসলো। ব'সেই স্টার্ট দিলো গাড়িতে।

ডাক্তার রায় এই অবস্থায় আপত্তি জানিয়ে বললেন,—'আরে—আরে দাঁড়াও। আমি নেমে পড়ি।'

কিন্তু কে কার কথা শোনে! ছোকরা বেশ তাচ্ছিল্যভাবেই অভয় দিলো ডাক্তার রায়কে—'তুম্ বৈঠে রহো, কুছ ডর্ নেহি।'

ডাক্তার রায়ের কথাকে আমল না দিয়েই ড্রাইভার গাড়িটাকে একবার এগিয়ে, একবার পেছিয়ে, আবার প্রায় ওখানেই এনে দাঁড় করালো। স্টার্ট বন্ধ করলো। এবার ডাক্তার রায়ের দিকে তাকিয়ে বললো—'আভি আরামসে বৈঠো।'

ড্রাইভারের ও-ধরনের কথাবার্তা আর আচরণ থেকে আভাস পাচ্ছি একটা রগড় জমাট বেঁধে উঠেছে। ডাক্তার রায়ও বুঝতে পেরে একটু একটু হাসছেন। আমরা তাঁর কাছে আবার এগিয়ে যেতেই বললেন—'এরা বড্ড একরোখা। কথাই শুনতে চায় না!'

আমরা হাসছি। ড্রাইভারও দেখি হাসছে। ও ভেবেছে বেশ একটা মজার ব্যাপার করেছি। তার কৃতিত্ব জাহির করতে তেমনি হেসে হেসে ডাক্তার রায়কে বোঝাতে লাগলো—'পণ্ডিতজীকা ওয়াপস্ আনেকো আভি টাইম্ হুয়া, ইস্‌লিয়ে গাড়ি লাইনমে রেডী কিয়া।' তারপর একটু খুশীর মাত্রা বাড়িয়ে বলতে লাগলো,—'তুম ডর্ গিয়াথা, বোলতা থা, আরে—আরে—।' বলেই ছোকরা খুব হাসতে লাগলো!

হাসি থামিয়ে ড্রাইভার পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বের করলো। আমি তখন দম্ বন্ধ ক'রে তীক্ষ্ণ নজরে তাকিয়ে দেখছি ওকে। মনে মনে আশঙ্কা করছি, এবার বুঝি ড্রাইভার ভদ্রতা প্রকাশ করবে—এই বুঝি প্যাকেটটা—।

না, নিজেই একটা সিগারেট ধরিয়ে প্যাকেটটা আবার পকেটেই রেখে দিলো। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম আমি! ড্রাইভার

তারপর নেমে চ'লে গেলো তার সঙ্গীদের কাছে। জানি না, ফালতু আদমী মনে করেই হয়তো ডাক্তার রায়কে সিগারেট অফার করেনি।

এই অস্বস্তিকর অবস্থায় ডাক্তার রায় কী মনে করছিলেন বলতে পারি না। তবে তিনি ঐ জীপে আর ব'সে থাকতে রাজী না হ'য়ে নেমে এলেন আমাদের কাছে। এই ব্যাপার নিয়ে কিন্তু কোনো আলোচনা হ'লো না, অথচ সবাই আমরা মজাটুকু উপভোগ করলাম।

*

ড্রাইভার বেচারীর দোষ ছিলো না। ওর মনে এ-ধারণাই জন্মেছিলো যে, ওদের মহারাজকুমার যাঁদের নিয়ে ঘোড়ায় চ'ড়ে গেছেন, তাঁরাই শুধু গণ্যমান্য। এখানে যারা র'য়ে গেছে, তারা নিশ্চয়ই তেমন কিছু নয়। নেহাতই ফালতু হিসেবে দলভুক্ত। ড্রাইভারের এই ভ্রম সংশোধন করতে আমরা কেউ চেষ্টা করিনি। কিছু বলিনি ওকে। ব'লে বোধ করি লাভও হ'তো না। ডাক্তার রায়েব পরিচয় পেলেও ড্রাইভার অনুতপ্ত বা লজ্জিত হ'তো কিনা বলা কঠিন। কারণ ওরা চিরকালই চৌকিদারকে জানে, হাকিমকে জানে না।



অতি মর্মান্তিক এক কাহিনীর সাক্ষী এই ছবিটা। এটা আমার গোচরে এলেই সারা দেহে রোমহর্ষ অনুভব করি। শিউরে উঠি যেন। অতীতের স্মৃতি বিজড়িত বহু ছবির ভেতর এই ছবিটা যেন একটি কলঙ্ক। তবে ছবিকে এ-অপবাদ দেওয়াটা ঠিক নয় বোধ করি, ওটা প্রাপ্য ছবিগত কাহিনীর। যে-কাহিনীর রচয়িতা সুন্দরবনের বাঘ।

দোষের হবে না, যদি কেউ 'সুন্দরবন' নাম শুনেই কল্পনায় গদ গদ হ'য়ে রচনা ক'রে থাকেন এক নয়নাভিরাম বন-সৌন্দর্যের রূপ। তাঁর কল্পনায় বাধা পাবে না স্নিগ্ধ রূপালী চাঁদ নদীতে নেমে এসে ডিঙ্গির তলায় খান্ খান্ হয়ে ডুবে যেতে। উপরন্তু যদি কেউ সুন্দরবনের

মধু-র আস্বাদন লাভ ক'রে থাকেন, তা হ'লে অবশ্যই তিনি এই বনানীর প্রেমে মুগ্ধ হ'য়ে বিহ্বলতায় বলবেন—আহা, না জানি কী সুমধুর সেই বন। সুন্দরবন!

কী ক'রে জানি না, কানা ছেলের নাম পদ্মলোচনের মতোই এই ভয়াবহ অরণ্য এলাকার নাম হয়েছিলো সুন্দরবন। এ-এলাকার বহু বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ না ক'রেও মোটামুটি বলা যায়—নৌকোয় ভ্রমণ-কালে ডিঙ্গির তলায় কুমীর চলে সাব্‌মেরিনের মতো, আর ডাঙ্গায় বনের আড়ালে আড়ালে চলে নরখাদক রয়্যাল-বেঙ্গল। জল স্পর্শ করলেই দেহটাকে চুম্বকের মতো টেনে নিয়ে যাবে সাব্‌মেরিন, আর স্থলে পদার্পণ মাত্রেই মিলবে রয়্যাল-বেঙ্গলের আলিঙ্গন। এসব আপদ-বিপদ সর্বজনবিদিত, তবুও দেখা যায় প্রতি বছরই বহু প্রাণ বেঘোরে হারায়। পেটের দায়ে যাদের মধু-সংগ্রহ কিংবা মাছ ধরার কাজে নামতে হয়, তারা বহু সতর্কতা অবলম্বন ক'রেও অনেক সময় রেহাই পায় না এইসব বিপদের হাত থেকে।

তেমনি সতর্কতায় একজন জেলে ডাঙ্গায় পা ছুঁইয়েছিলো মাত্র, আর তখুনি কোথা থেকে এক বাঘ এসে লাফিয়ে পড়লো তার ওপরে। তাই না দেখে, ডিঙ্গি থেকে সঙ্গীরা সবাই হৈ হৈ চিৎকার ক'রে বৈঠা-লাঠিসোটা নিয়ে ডাঙ্গায় নেমে এসেও কোনো সুবিধা করতে পারলো না। ওদের চিৎকার-হল্লার ভেতর সঙ্গিটি ব্যাঘ্রকবলমুক্ত হ'তে আপ্রাণ চেষ্টা করলো, কিন্তু ব্যর্থ হ'লো সব। শেষ একটি আর্তনাদে জানিয়ে দিলো তার পরিণতি। ঘাড় মট্‌কে বাঘ নিয়ে গেলো তাকে টেনে-হিঁচড়ে বনের ভেতরে। বনের পথে রেখে গেলো বাঘের পদচিহ্ন আর মানুষের রক্তের ছাপ।

যেদিন এই ব্যাপারটি ঘটেছিলো সেদিনই আমরা লাট্‌সাহেবের সুন্দরবন ভ্রমণ উপলক্ষে স্টীম-লঞ্চে ক'রে যাচ্ছিলাম সেই নদীপথে। বেলা দ্বিপ্রহর তখন। আমাদের নজরে এলো জেলেদের বহু ডিঙ্গি একত্রিত করা। ভাবলাম, জেলেরা মাছ ধ'রে এখন হয়তো খাওয়া-

দাওয়া সারছে। বলাবলি ক'রে স্থির করলাম, কিছু মাছের সন্ধান করা যাবে। আমাদের লঞ্চ দাঁড় করানো মাত্রই দেখি একটি ডিঙ্গি ছুটে আসছে আমাদেরই দিকে। আমরা সবাই আশান্বিত হ'য়ে মনে মনে কল্পনা করতে লাগলাম টাট্‌কা ভেট্‌কি আর চিংড়ির কথা। আমাদের কতটা প্রয়োজন হবে তাও মনে মনে প্রায় স্থির ক'রে ফেলেছি।

ডিঙ্গিটা লঞ্চের কাছে এসে ভিড়লো। করজোড়ে একজন দাঁড়িয়ে কাতরকণ্ঠে জানালো—'হুজুর, আমাদের একজনকে বাঘে নিয়ে গেছে।'

—'বাঘে নিয়ে গেছে? কখন?'

—'তা হুজুর চার-পাঁচ ঘণ্টা হবে।'

—'কি ক'রে নিলো? তোমরা ছিলে কোথায়?'

—'আজ্ঞে আমরা এই ডিঙ্গিতেই ছিলাম। ডিঙ্গিটা খালে বাঁধা ছিলো জোয়ারের জলের অপেক্ষায়। তা জল আসতেই লোকটা ডাঙ্গায় নেমেছিলো দড়িটা খুলতে। মাত্র নেমেছিলো, আর হুজুর একটা বাঘ এসে অমনি ওর ওপর লাফিয়ে পড়লো। আমরা কিছু করতে পারলাম না, ওকে টেনে নিয়ে গেছে জঙ্গলের ভেতরে।'

আমাদের লঞ্চে যাঁরা এ-কাহিনী শুনছিলেন, তাঁদের ভেতর অনেকেই মাছের নাম দূরে থাক, নিজের নামই প্রায় ভুলে গেলেন। আতঙ্কে সবাই যেন বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। আমাদের ভেতর বোধ করি বনবিভাগের বড়কর্তা ছিলেন। তিনিই জেলেদের প্রশ্ন করলেন—'তা তোমরা এখন কি করতে চাও?'

—'আমরা হুজুর আর কিছুই করতে পারি না। আমরা সেই থেকে ব'সে আছি, কোনো কিছু করবার হদিস পাচ্ছি না। হুজুর আপনাদের বন্দুক আছে, আপনারা দয়া ক'রে যদি লাসটা আনবার ব্যবস্থা ক'রে দেন তো—।'

আমরা ভাবলাম, কী সাংঘাতিক কথা! লোকটা বলে কী? জঙ্গলের ভেতরে গিয়ে বাঘের মুখের আহার কেড়ে নিয়ে আসা? ওটা যে রয়্যাল-বেঙ্গলের সান্ধ্য ভোজের আহার!

বন বিভাগের বড়কর্তা ইতিমধ্যে কি যেন একটু ভেবে নিয়ে বললেন—'আচ্ছা দাঁড়াও।' বলেই ভদ্রলোক ভেতরে এসে তাঁর রাইফেলটি নিয়ে প্রস্তুত হ'য়ে এলেন। সঙ্গে আরও একজন বন্দুক-ধারীকে নিয়ে তাঁরা নৌকোয় রওয়ানা হলেন ডাঙ্গার দিকে। আমরা বুঝলাম ভদ্রলোকের এসব বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে।

কিছু সময় কেটে গেলো। আমরা উৎকণ্ঠায় তাকিয়ে আছি সেই বন আর ডিঙ্গির দিকে। কিছুই কল্পনা করতে পারছি না তখন। এক সময় ডিঙ্গি ফিরে এলো, দেখি তার ভেতরে প'ড়ে আছে সেই লোকটির দেহ। ক্ষত-বিক্ষত একটি লাস। ঘাড় মট্‌কে বুক চিরে রক্ত শোষণ করার চিহ্ন তার দেহে অতি সুস্পষ্ট। জেলেদের দেখে মনে হ'লো ওরা খুব সন্তুষ্ট। ওদের আর চিন্তা করার কিছু নেই। বাড়ী থেকে যতজন এসেছিলো ততজনই ফিরে যাবে।

*

এ ঘটনা বছর ত্রিশ অতীতের। প্রত্যক্ষভাবে আমি সেদিন যতটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলাম, তাতেই আমার মন থেকে সুন্দর-বনের সুন্দরত্বটুকু মুছে গিয়েছিলো। যেটুকু অবশিষ্ট ছিলো, তাতে এখনও কল্পনা করতে পারি সেই ভয়ঙ্কর স্থানটির কথা—যেখানে বাঘ, কুমীর আর মানুষ এক গণ্ডির ভেতরে বসবাস করে স্বতন্ত্র অধিকার বজায় রেখে। যেখানে জেলেরা বাঘের মুখে প্রাণ তুলে দিতে রাজী, কিন্তু আপত্তি শুধু প্রাণহীন দেহ ছেড়ে দিতে। এটা বোধ হয় ওদের অধিকারগত প্রশ্ন।



আসামের কামরূপ জেলার একটি গ্রাম। গ্রামের নাম চাংসারী। ব্রহ্মপুত্রের উত্তর ভূমিখণ্ডের এই গ্রামটি আর আর সাধারণ গ্রামের মতোই। কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, কোনো আকর্ষণ নেই। আমার সেখানে আকর্ষণ ছিলো শুধু এক বয়োজ্যেষ্ঠ দিলখোলা বন্ধু ও তার গিন্নী, যাদের দৌলতে এই গ্রাম্য মেয়েটির ছবি তুলেছিলাম একদিন। মেয়েটির নাম দিপেরী।

বহু বছর আগে একবার পুজোর ছুটিতে গৌহাটি গিয়ে একদিনের

চ'লে গিয়েছিলাম এই চাংসারী গ্রামে। মনে আছে সেদিন সকাল রুই মাঠে-প্রান্তরে ঘোরাঘুরি ক'রে মন মেজাজের সুর পালটে াছে, চোখ জুড়িয়ে গিয়েছে মাঠে-মাঠে নিশ্চিত ধান-ফসলের সার্থক দেখে। শরতের এমন অসীমছাওয়া নীল আকাশের নীচে যা দেখছি সবই যেন মনে হচ্ছে অতি সুন্দর।

মনের আনন্দে সেদিন গ্রাম-পল্লীর ছবিও তুলেছি কিছু। কিন্তু র পাড়ে ভরাকলসী কাঁখে গ্রাম্য বালিকার সুন্দর রূপটি তুলতে বনি ব'লে আমার বন্ধুকে কথাটা জানালাম।

বন্ধু তো হো-হো-ক'রে হেসে উঠলো আমার কথা শুনেই। পর কিছু অকথ্য বিশেষণ আমার ওপর প্রয়োগ ক'রে জিজ্ঞাসা লা—'আমার বউকে দিয়ে চলবে?'

আমি কোনো জবাব দিলাম না।

বন্ধু বললো—'বুঝেছি দাঁড়াও, এই কাছেই একটি চাষীর মেয়ে ছ, ওকে নিয়ে আসছি এখুনি।'

কিছু পরে ঠিকই নিয়ে এলো এই মেয়েটিকে। ওর হাতে আবার কলসী। কাছে এসে বন্ধু বেশ মেজাজী হুকুমের মতোই বললো—একটা বিয়ের ছবি তুলে দিও কিন্তু!' কথাটা শুনে সলজ্জ হাসি উঠলো মেয়েটির মুখে।

পুকুর পাড়ে আমার নির্দেশমতো ভরাকলসী মাথায় আর কাঁখে যখন মেয়েটি এগিয়ে আসছিলো, হঠাৎ বন্ধু তখন রসিকতা ক'রে লা—'দিপেরী, তোকে এই বন্ধু বিয়ে করবে বলেছে।' অমনি ক'রে হেসে ফেললো দিপেরী। এই সুযোগে আমি ঠিক ছবি নিলাম। তারপর আরো একটা এমনি ছবি তুলে দিলাম। চ পারে বিয়ের ছবি!

সেদিন অনেকক্ষণ বন্ধুর বাড়িতে ছিলাম। লক্ষ্য করলাম ছবি লার পরই পড়শীদের একটু বেশী আনাগোনা চলছে ও-বাড়িতে। াদের ঘরেও উঁকিঝুঁকি মারছে। ব্যাপারটা একটু সন্দেহজনক

মনে হ'লো। বন্ধুকে প্রশ্ন করেও জবাব পেলাম না। শেষকালে রহস্যটা ফাঁস ক'রে দিয়ে বন্ধু-পত্নী জানালো যে, দিপেরীকে আমার পছন্দ হওয়ার কথাটাই নাকি জানাজানি হ'য়ে গেছে।

এবার বন্ধু একটা অট্টহাসি দিয়ে তার গিন্নীকে বললো—'আরে রগড়টা জমতে দাও। তুমি কিছু বলতে যেওনা কিন্তু।'

মাস দু'-তিন পরে, বোধকরি বড় দিনের ছুটিতেই, আবার আমাকে গৌহাটি যেতে হ'লো। তখন মনে ক'রে সঙ্গে নিয়ে গেলাম ওদের ছবিগুলো। ভাবলাম এ-ছবি দিতে গিয়ে আবার একদিন বেশ আনন্দ করা যাবে। চ'লে গেলাম একদিন আমার প্রিয় সেই চাংসারী গ্রামে।

পাকা রাস্তা ছেড়ে পল্লীর আঁকা-বাঁকা পথ ধ'রে চলেছি। অতি পরিচিত, আমার এই পথটুকু। কতবার যাতায়াত করেছি শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায়। পথের ছন্দগুলো কবিতার মতোই প্রায় মুখস্থ হ'য়ে গিয়েছে। মনে মনে কল্পনা করছি বন্ধুর বাড়িতে আনন্দময় পরিবেশের কথা। ভাবছি এবারও না জানি কত রগড় হবে। জানি না দিপেরীর বিয়ের কথাটা শেষ পর্যন্ত কতদূর গড়িয়েছিলো। বেচারী দিপেরীর মুখখানা মনে পড়লো—কতো সহজ-সরল হাসি ফোটে ওর মুখে! এসব নানা কল্পনায় আমার মুখেও বোধ করি হাসি ফুটে উঠেছিলো ঐ মাঠের পথেই। পথে দু-একজন চাষীকে দেখেছি ওরা যেন আমাকে ভালোভাবে লক্ষ্য করছে। যাক্ ওটা এমন কিছু নয়, আগন্তুক দেখলে এমন হয়েই থাকে। আমি চলেছি একমনে বন্ধুর বাড়ীর দিকে। দুপুর তখন গড়িয়ে যাচ্ছে।

অতি অপ্রত্যাশিতভাবে আমাকে দেখতে পেয়ে বন্ধু আনন্দে উল্লসিত হ'য়ে উঠলো। প্রায় চেঁচিয়ে গিন্নীকে ডাকলো—'দেখে যাও কে এসেছে!' বন্ধু-পত্নীও মহাখুশিতে এসে বসলো আমাদের সঙ্গে।

প্রশ্ন করলো—'কী ব্যাপার, হঠাৎ যে?'

—'দিপেরীকে বিয়ে করতে।' আমি বললাম।

আমার এই রসিকতটা যেন ঠিক হ'লো না। মনে হ'লো, কোথাও একটু গোলমাল আছে। যাইহোক, পরিবেশকে আনন্দময় ক'রে তুলতে আমি দিপেরীর ছবি দুটো দিলাম ওদের হাতে। কিন্তু ছবি দেখে দুজনেরই যেন মুখের ভাব পালটে গেলো। তবুও তন্ময় হ'য়ে চোখের কাছে ধ'রে রইলো ছবি দুটো। মুখে কোনো কথা নেই। আমি যা আশা করেছিলাম তা না পেয়ে একটু নিরাশ হলাম। ওদের নীরবতায় অস্বস্তি জাগলো আমার মনে। কী এমন—?

এবার চোখ থেকে ছবি নামিয়ে বন্ধু তার স্ত্রীকে বললো—'রেখে দাও ছবি দুটো। ওদের এখন দেখিও না, তা হলেই ওর মা কেঁদে-কেটে একাকার করবে। নীরোদ বেড়াতে এসেছে, ও কেন এসব অশান্তির মধ্যে পড়বে!'

এইটুকু কথাতেই অন্তর্নিহিত অর্থ খুঁজে পেতে কষ্ট হ'লো না। তবুও মনে হ'লো আমার মস্তিষ্কের শিরাগুলো যেন কাজ করছে না। বন্ধুর মুখেই এবার শুনলাম দিপেরীর মৃত্যু হয়েছে আজ প্রায় একমাস।

*

এই ব্যাপারে আমার মনে অশান্তির ছায়া পড়া উচিত কিনা জানি না। বন্ধু সেজন্য চেষ্টাও করেছিলো সেদিন নানা কথায় নানাভাবে এই বেদনাময় কাহিনী চেপে রাখতে। কিন্তু তা সম্ভব হয়েছিলো কি? নিশ্চয়ই হয় নি। না-হ'লে সেদিন চাংসারী গ্রাম ছেড়ে আসার সময় কেন আমার মনে হ'লো—শরতের সেই পল্লী শোভায় ধূসর-ছায়া বিছিয়ে রয়েছে! আর কেনই বা আমার নজরে এলো ফসল-কাটা জমির বুকে ফাটলের বহু চিহ্ন!



যদিও এই ছবিটি 'বন্দী' নামে নানা পত্রিকায় তখন ছাপা হয়েছিলো এবং কয়েকটি প্রদর্শনীতেও বিশেষ স্থান অধিকার করেছিলো, কিন্তু আসলে সে বন্দী ছিলো না। সে আমারই বন্ধু দ্বিজেশ সেন। পাশের বাড়ির।

প্রায় বছর চল্লিশ আগের কথা। তখন আমি ফটোগ্রাফির জগতে প্রবেশাধিকার অর্জন করেছি মাত্র। নানা স্থানের বিভিন্ন পত্রিকায়

কিছু কিছু ছবি ছাপা হয়েছে, গৌহাটি থেকেই দূর দেশের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটছে ফোটোগ্রাফির মারফত। কাজেই তখন আমার ছবি তোলার উৎসাহ একটু বেশী, সর্বদাই নজর রাখছি ছবির বিষয়-বস্তুর দিকে।

বন্ধু ম্যাট্রিক পাস করেই কলকাতা চ'লে এসে একটি কলেজে নাম লিখিয়েছে। কিছুদিন বাদে একদিন হঠাৎ দেখি সে ফিরে এসেছে গৌহাটিতে। শুনলাম, কলকাতায় আর লেখাপড়া করবে না। ফিরে আসার আসল কারণ কি—তা জানতে আমরা মোটেই উৎসুক ছিলাম না। যদি বন্ধু বোঝাতে চেষ্টা করতো কলকাতায় লেখাপড়ার স্টাণ্ডার্ড গৌহাটির তুলনায় নিচু, তাও আমরা মেনে নিতাম বিনা প্রতিবাদে। মোটের ওপর আমরা সবাই খুশী হলাম অন্তরঙ্গ বন্ধুর প্রত্যাবর্তনে। আনন্দ হ'লো আমাদের দলের একজন একনিষ্ঠ আড্ডাবাজ সভ্যকে ফিরে পেয়ে।

তখনকার দিনে মফস্বলে কলকাতা-ফেরত কোনো লোক বর্তমানের একজন বিলেত-ফেরতের চেয়েও বেশী আমল পেতো। বন্ধু এই বিশেষ সুযোগ পেয়ে খুব জমিয়ে বসলো মফস্বলী বন্ধুদের নিয়ে। আমরা অতি মনোযোগ দিয়ে হাঁ ক'রে শুনি তার কলকাতার গল্প, আর কল্পনার ক্ষমতা শক্তিতে রচনা ক'রে নিই অদেখা বিষয়বস্তুর রূপ। মনে মনে আফসোস করি আমাদের মন্দ ভাগ্যের জন্য। প্রায় বিলেত যেতে না-পারার মতোই আফসোস।

বয়সের ধর্মেই হয়তো বন্ধু তার বিশেষ গোপনীয় একটি কথা আমার কাছে ব'লে ফেললো একদিন। সে নাকি পালিয়ে এসেছে কলকাতা থেকে, কারণ কি একটি বোমার মামলার সঙ্গে তার নাম জড়িত হওয়ায় পুলিস তার পিছু নিয়েছে। পুলিসের ধর-পাকড় শুরু হতেই সে একদিন খ'সে পড়েছে চুপচাপ।

গোপনীয় কথার ধর্মই হচ্ছে অতি সত্বর বিস্তৃতভাবে সেটা জানাজানি হওয়া। তাই এ-কথাটিও বন্ধুমহলে ছড়িয়ে পড়তে বেশী

দিন লাগলো না। যদিও তখন ইংরেজ-নিধন-যজ্ঞে বাঙালী যুবসমাজ ত্রাসের সঞ্চার করেছিলো, গুলি-বোমা চলছিলো চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, মেদিনীপুর, কলকাতায়—যদিও জানতাম টিটাগড় আর মেছুয়াবাজারের বোমার মামলা আদালতে ঝুলছে—তবুও কেন জানি না, বন্ধুকে আমরা সেই দলভুক্ত করতে রাজী হই নি। আমরা অপরের মাইনের অঙ্কটা যেমন ডিস্‌কাউন্ট দিয়ে হিসেব করি, তেমনি অনেকেই বুঝে নিলাম, কথাটায় ভেজাল আছে।

বন্ধু একটু সরল প্রকৃতির ব'লেই বোধ করি তার এ-কথাটা আদৌ আমল পেলো না। কেউ বিশ্বাস করলো না। কিছুদিন পর যখন এ-প্রসঙ্গ চাপা প'ড়ে গেলো, তখন বোঝা গেলো কলকাতার গুল্‌ মাঠে মারা গেছে।

যাই হোক, আমি আছি আমার তালে। বন্ধুর একমাথা ঝাঁকড়া চুল দেখে একদিন কেন জানি না আমার ইচ্ছে হ'লো এই ধরনের একটা ছবি তুলতে। এতে মোটেই অসুবিধে নেই, তাই বন্ধুকে জানালাম কথাটা। এই ব্যবস্থামতো একদিন দুপুর বেলা ওদের ঘরেই জানালার মোটা শিক ধ'রে দাঁড় করিয়ে দিলাম বন্ধুকে। মনোমতো ক'রে তুললাম এই ছবিটি।

কিছুদিন বাদেই ঘটলো এক আশ্চর্য রকমের ঘটনা।

সেদিন বিকেল বেলা বাড়িতে ফিরছি, দেখি পাশের বাড়ির ফটকে বহু লোক জট্‌লা পাকানো। কী ব্যাপার জানতে গিয়ে দেখি বাড়ির ভেতরে পুলিসের লোকজন। শুনলাম, দ্বিজেশকে ধ'রে নিতে এসেছে; সে নাকি কলকাতার এক বোমার মামলার আসামী। হতবাক হ'য়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম ফটকের একপাশে। বাড়ীর ভেতরে যেতে আমার পা অগ্রসর হ'লো না। ওদের নিজের লোক-জনের বিষণ্ণ বদন, অনেকের অশ্রুসিক্ত নয়ন, মুষড়ে পড়েছে সবাই। যদিও এ-সময় আমার ভেতরে যাওয়া কর্তব্য, তবুও কেন জানি না যেতে পারলাম না। কেবলি আমার মনে গত কয়েকদিনের নানা কথা

এসে আমাকে অশান্ত ক'রে তুলছিলো।

পুলিস বেষ্টনীতে বন্ধুকে বাড়ী থেকে নিয়ে রওয়ানা হয়েছে। এগিয়ে আসছে। ফটকের কাছাকাছি আসতেই আমার চোখাচোখি হ'লো। বন্ধু শুধু মাথা নেড়ে জানালো—যাই। ওর মুখে তখনো হাসি ছিলো। আমার ছিলো না।

*

অতীত দিনের বিবর্ণ স্মৃতিতে এ-ছবি আজো স্মরণ করিয়ে দেয় ছবি তোলার পরবর্তী কাহিনী। বন্ধুর ছবি কিংবা ছবির মর্যাদা—কিছুই তেমন মনে ধরে না। মনকে শুধুই আচ্ছন্ন ক'রে দেয় সেই ঘটনাতেই, যেখানে আমার পরিকল্পিত ছবি শেষকালে বাস্তব রূপ নিয়েছিলো। এতে বেদনা আর আনন্দের মিশ্রিত অনুভূতি জেগেছে মনে। গর্বও অনুভব করেছি, কারণ ব্রিটিশের হাতে রাজনৈতিক বন্দীরা তখন ভারতবাসীর সম্মানিত জন।

বন্ধু এখনো সেই সম্মানের অধিকারী।



পুলিসের কাজই হচ্ছে চোর-ডাকাত-খুনী ধরা। সেটা অপরাধ নয়। তেমনি অপরাধ নয় বেড়ালের ইঁদুর মারাটা। কিন্তু আমি এ-কাজকে দোষণীয় প্রমাণ করতে বহু আয়াস ক'রে তুলেছিলাম এই ছবি। ছবির নামকরণ করেছিলাম 'অপরাধী'।

একদিন সকালে আবিষ্কৃত হ'লো আমাদের বাড়ির রান্না-ঘরের পেছনে একটা ধেড়ে-ইঁদুর ম'রে প'ড়ে আছে। কাছে গিয়ে ফরেনসিক্ বিশেষজ্ঞর মতো মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করতে চেষ্টা করলাম। দেখলাম

বেশ মোটা-সোটা ইঁদুর, দেহে কোনো ক্ষত চিহ্ন নেই। তখনকার দিনে থ্রম্বোসিসের প্রচলন ছিলো না, না-হ'লে সেই জাতীয় একটা রোগজনিত কারণেই মৃত্যু ঘটেছে ব'লে চালিয়ে দেওয়া যেতো। যাই হোক, এটা যে হত্যাকাণ্ড নয় সে বিষয়ে আমি পুরোপুরি নিশ্চিত ছিলাম।

আমার এতোটা নিশ্চিত হবার কারণ ছিলো বৈকি। আমাদের এই বেড়াল ইতিপূর্বে এমন কোনো কাজের নজির রাখেনি, যাতে ক'রে ওকে সন্দেহ করা যেতে পারে। তাছাড়া আমরা জানি, এতো বড়ো ইঁদুরকে ঘায়েল করা আমাদের ঐ বেড়াল কেন—বহু মানুষের পক্ষেই কষ্টকর।

একদা স্কুলে কঠিন সংস্কৃত অক্ষরে-রচিত 'মার্জার কথা' বহু কষ্টে পড়েছিলাম। সংস্কৃত অক্ষর মন থেকে মুছে গেছে, তবে মনে আছে সেই ভণ্ড বেড়ালটির কথা। আমাদের বেড়ালটি আদৌ ভণ্ড ছিলো না, প্রকৃতই সে ছিলো নিস্পৃহ এবং মনে হ'তো বৃন্দাবন বা নবদ্বীপের কোনো বেড়ালের বংশজাত। তার মাছ-মাংসে লিপ্সা নেই, রাগ-হিংসার প্রকাশ নেই, প্রহার করলেও প্রতিবাদের কিছুমাত্র আভাস দেয় না। এমন কি চলা-ফেরায়ও যেন একটা অনিচ্ছার ভাব। তা হ'লে কী ক'রে এই হেন বেড়ালকে আমরা এতোদূর গর্হিত একটা কাজের জন্য দায়ী করতে পারি?

আমাদের বেড়ালের চরিত্র সম্বন্ধে এতোটা ওয়াকিবহাল ছিলাম ব'লেই মনে মনে বেড়াল-ইঁদুরের একটা আকর্ষণীয় ছবি তুলবার কথা কল্পনা করলাম। ভাবলাম সহজেই ভালো ছবি তোলা যাবে। কীভাবে ছবি তুলবো না-তুলবো তার সব প্ল্যান মনের ভেতর রেখে, ছুটলাম দোকানে ফিল্ম কিনে আনতে। বাড়িতে ব'লে গেলাম, কেউ যেন ইঁদুরটাকে না সরায়।

ক্যামেরা রেডি ক'রে বেড়ালের সন্ধান করতে গিয়ে দেখি সেটা নেই। অনেক খোঁজাখুজি করলাম, কিন্তু কোথাও পেলাম না। ব্যর্থ

চিত্তে এদিক ওদিক করছি, আর একবার ক'রে দেখে আসছি ইঁদুরটাকে। ওটাকে না শেষকালে কাকে নিয়ে যায়!

বেলা দুপুর পর্যন্ত বেড়ালের দর্শন পেলাম না। ওদিকে স্নান-আহারের জন্য তাগিদ আসছে ঘন ঘন। মনের ভেতর দারুণ একটা অস্বস্তি নিয়ে অবশেষে চাকরটাকে ইঁদুরের পাহারায় নিয়োগ ক'রে আমি বাথরুমে চ'লে গেলাম।

আহারে বসেছি মাত্র, দেখি বেড়ালটা কোথা থেকে হঠাৎ ঘরে এসে ঢুকলো। মনের আনন্দে আমি তখনি খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়তে গিয়েছিলাম। কিন্তু তা করলাম না। ভাবলাম, বেড়ালকে একটু খাইয়ে ভাব জমিয়ে নিই, তা হ'লে ছবি তুলতে বেশী বেগ পেতে হবে না।

কোনোমতে আহারের ঝামেলা চুকিয়ে বেড়ালটিকে নিয়ে চ'লে গেলাম রান্না-ঘরের পেছনে ঘটনাস্থলে। ভেবেছিলাম, ইঁদুর পেলেই বেড়াল কামড়ে ধ'রে মুখে তুলবে, না-হয় ওটাকে নিয়ে আনন্দে খেলা করবে—আর তখনি আমি ছবি তুলবো একটার-পর একটা।

কিন্তু এ কি! ক্যামেরার ফোকাস-স্পীড সব ঠিক রেখে যখন ইঁদুরের কাছে বেড়ালকে বসালাম, তখন লক্ষ্য করলাম ওর ভাবের কোনো পরিবর্তন ঘটলো না। সেই নিস্পৃহ বৃন্দাবনী ভাব নিয়ে ব'সে রইলো। তাও বেশীক্ষণ থাকতে চায় না, চ'লে যেতে চায়। বুঝলাম সব প্ল্যান মাটি হ'লো। সেই সকাল থেকে হুজ্জতি ক'রে শেষকালে ব্যর্থ হওয়ায় মেজাজটা বিগড়ে গেলো। দিলাম বসিয়ে দু'তিন ঘা। অনেক সাধু-পুরুষ নাকি থানার লক-আপে 'এক-নম্বর', 'দু'নম্বর' দাওয়াই-এর ঠেলায় স্বরূপ প্রকাশ ক'রে ফেলে। কিন্তু আমার সাধু-বেড়ালের তেমন কোনো আভাসই পেলাম না। যেখানে যেভাবে বসিয়ে দিচ্ছি, সেভাবেই ঠিক থাকছে। কী আর করি, শেষকালে ইঁদুরের পেছনে একবার বসিয়ে দিয়ে একটা ছবি তুললাম। তারপর

ইঁদুরটাকে ফেলে দিয়ে এলাম রাস্তায়।

*

আমার 'অপরাধী' ছবি কয়েকটি প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হয়েছিলো এবং প্রদর্শনীতেও স্থান পেয়েছিলো। ছবিটি আমার খুবই পছন্দসই। কিন্তু এই ছবি হাতে নিয়ে যখনি ছবি তোলার কাহিনী স্মরণ করেছি, তখনি এই বেড়ালের অপরাধী-মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন জেগেছে মনে—বেড়ালটি সত্যিই কি অপরাধী ছিলো? না আমিই নির্দোষ বেচারীকে অপরাধী সাজিয়ে নিজে অপরাধ করেছি?



পুষ্পমাল্য গলায় অভিনন্দিত শাহ্‌নওয়াজের ছবিটিতে তেমন কিছু বিশেষত্ব নেই। আছে শুধু এই ছবি-তোলার কাহিনীতে। আজো স্পষ্ট মনে পড়ে, তালে-গোলে সেদিন সব যোগাযোগ যেন একটার পর একটা সহজ হ'য়ে এলো। আর ফাঁকতালে আমি কাজ হাসিল ক'রে বের হ'য়ে এলাম। হয়তো সেদিন কোনো গ্রহের প্রভাব অতি প্রবল ছিলো আমার ওপর। যেটা সিংহ রাশির পক্ষে অনুকূল।

অবশ্য সেদিনটি নিঃসন্দেহে ভারতবাসীর কাছে স্মরণীয়। ১৯৪৬ সালের ৪ঠা জানুয়ারি দিল্লির গগন সোনালী আলোতে উদ্ভাসিত হয়েছিলো প্রভাত হ'তে না-হ'তেই। আলোর কিরণচ্ছটায় প্রচণ্ড

শীতের প্রকোপ পর্যন্ত স'রে গেলো আড়ালে। পথে-ঘাটে, আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হ'লো সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত সংবাদ—আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর যোদ্ধারা মুক্তিলাভ করেছেন।

অচিরেই উল্লসিত জনতায় পথঘাট ছেয়ে গেলো, চতুর্দিক থেকে সবাই ছুটলো মুক্ত বন্দীদের দর্শন করতে। অভিনন্দন জানাতে। অনেকে কেন ছুটছে তা নিজেরাই জানে না। স্বতস্ফূর্ত আনন্দে সবাই উন্মাদ-প্রায়। ততক্ষণে সারা দেশ জেনে গেছে—লালকেল্লার ঐতিহাসিক বিচারের অবসান ঘটেছে, শাহ্‌নওয়াজ-সেগল-ধীলন সবাই বীর-সম্মানে মুক্তিলাভ করেছেন।

দিল্লির যখন ওই হাল, তখন আমারও ইচ্ছে হ'লো এই বীর সন্তানদের একবার দেখতে এবং সম্ভব হ'লে ছবিও তুলতে। কিন্তু সে-সময় আমার ইচ্ছার কে ধার ধারে? তবুও ক্যামেরাটা কাঁধে ফেলে এসে দাঁড়ালাম গোল-মার্কেটের পথের ধারে। দাঁড়িয়ে দেখছি পথে ব'য়ে-যাওয়া উল্লসিত জনস্রোত, আর ভাবছি—কোথায় কীভাবে গেলে এই বীরদের দেখতে পাবো, ছবি তুলতে পারবো! কিছুই তো আমার জানা নেই, কে আমাকে এ-সবের হদিস দেবে? দিল্লিতে তো আমি বেড়াতে এসেছি।

আনন্দে মুখরিত জনতা-বোঝাই টাঙার দল ছুটে চলেছে হরদম। আমার কাঁধে ক্যামেরা দেখে কিনা জানি না, হঠাৎ দেখি একটি টাঙা রোখ্‌কে-রোখ্‌কে ব'লে থেমে গেলো আমার কাছেই। একজন আমাকে ডেকে বললো—'জলদি আইয়ে, আপ যাইয়ে গা না?'

কথার থেকে কাজ এখানে দ্রুততর হ'লো। কাউকে জানিনা-শুনিনা অথচ দিব্বি চেপে বসলাম ওদের সঙ্গে। টাঙা আবার ছুটে চললো দরিয়াগঞ্জের দিকে। আমি বেশী কথা বলছি না। সেই ভদ্রলোকই একবার বললেন—'আমরা আপনাকে আই-এন-এ অফিসে নামিয়ে দেবো, সেখানে গেলেই সব পাত্তা পাবেন।'

আই-এন-এ অফিসের দরজায় টাঙা থেকে নেমেই, দারুণ একটা

স্পীডের মাথায় অফিস-ঘরে প্রবেশ ক'রে দেখি ঘরময় লোক ভরতি। অতি ব্যস্ত এক ভদ্রলোক টেবিলে বসে শুধু 'নেহি-নেহি' ব'লে আপত্তি জানাচ্ছেন। চতুর্দিকের কথায় জর্জরিত তিনি। এ-অবস্থায় আমার দিকে তাকাতেই আমি বললাম—'আই অ্যাম ফ্রম ক্যালকাটা...।' কথা শেষ না হ'তেই—'আচ্ছা তো ঠিক হ্যায়—' ব'লেই অফিসের কাগজে খচ্ খচ্ ক'রে লিখে দিলেন "ক্যালকাটা প্রেস"। আমাকে আর কোনো প্রশ্ন বা কথা বলার অবকাশ না দিয়ে একটা বাড়ির ঠিকানা বললেন। সেখানেই তিন বীর সন্তানের দেখা মিলবে। পাশের চেয়ারে উপবিষ্ট এক ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে বললেন—'চলিয়ে হাম ভি যা-রহা হ্যায়।' আর কথা নেই, ভদ্রলোকের সঙ্গে বাইরে এসে তাঁর গাড়িতে বসলাম। তিনিই ড্রাইভ ক'রে আমাকে নিয়ে চললেন সেই বাড়িতে।

যে বাড়ির সামনে আমাদের গাড়ি দাঁড়ালো, যেখানে শত শত লোক বাইরে অপেক্ষা করছে মালা হাতে। বোধ হয় ভুল করেই আমাদের গাড়ি ঘিরে ধরলো সবাই। ইতিমধ্যে ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নেমে আমাকে এগিয়ে নিয়ে চললেন। বাড়ির বারান্দায় অতি-ব্যস্ত কয়েকজনকে আমার কথা কি বললেন বুঝলাম না, দেখি একজন এগিয়ে এসে আমাকে অতি সমাদরে ভেতরে নিয়ে গেলেন। বললেন —'এখন শাহ্‌নওয়াজ শুধু এখানে আছেন, সেগল আর ধীলন বাইরে গেছেন, আসবেন এক্ষুনি। আপনি ততক্ষণে একটু চা খান।' সঙ্গে সঙ্গেই চা আর খাবার দিয়ে গেলো একজন।

আমার কোনো ভাবনা-চিন্তার সুযোগ আসেনি সেই সকাল থেকে। এখনও ভাবতে পারছি না তারপর কি হবে! একবার শুধু ভদ্রলোককে বললাম—'শাহ্‌নওয়াজের ছবিটা এখন তুলে ফেললেই তো হয়! এক মিনিটের জন্য ঘরের বাইরে এলেই চলবে।' ভদ্রলোক তখুনি ভেতর মহল থেকে শাহ্‌নওয়াজকে নিয়ে এসে বললেন—'চলিয়ে মিস্টার দত্ত।'

জানি না আমি হঠাৎ কী ক'রে 'দত্ত' হ'লাম। তখন তাই মেনে

নিয়ে শাহ্‌নওয়াজের সঙ্গে বাইরে এলাম। আর সঙ্গে সঙ্গেই আকাশ কাঁপিয়ে জয়ধ্বনি শুরু হ'লো—'জয় হিন্দ! নেতাজী জিন্দাবাদ! আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ! শাহ্‌নওয়াজ—'

শাহ্‌নওয়াজের গলায় তখন মালার বোঝা বেড়েই চলেছে। ইতিমধ্যে আমি ছবি তুলে নিয়েছি, কিন্তু উন্মত্তপ্রায় জনতার আক্রমণে এমন এক পরিস্থিতি ধারণ করলো যে, শাহ্‌নওয়াজকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে না গেলে সেই ভদ্রলোকের বাড়িটি শেষ পর্যন্ত আস্ত রাখতে পারতেন কিনা সন্দেহ। ভেতরে এসে ভদ্রলোক আমাকে বললেন—'যা অবস্থা দেখছেন তো মিস্টার দত্ত? আপনি এখন এ-ঘরে বিশ্রাম করুন, ওরা সবাই এলে আমরা একসঙ্গে লাঞ্চ খাবো। আপনিও থাকবেন। তারপর আমরা বিকেলে গান্ধী-ময়দানে যাবো, সেখানে এঁদের সম্বর্ধনায় আসফ আলী সাহাব বক্তৃতা করবেন।'

এবার প্রমাদ গুণলাম। ভাবলাম তালে-গোলে আমার কাজ হাসিল হ'য়ে গেছে, আর থাকাটা নিরাপদ নয়। শেষকালে সব ফাঁস হ'য়ে যাবে। তখুনি বুদ্ধি ক'রে বিকেলের মিটিং এবং জরুরী টেলিগ্রামের গুরুত্ব দেখিয়ে চ'লে এলাম ও-বাড়ি থেকে। পথে এসেই এক টাঙা নিয়ে ছুটলাম সোজা গোল-মার্কেট।

ফেরার পথে গোটা ব্যাপারটা স্মরণ ক'রে মনে মনে খুব আশ্চর্য বোধ করছিলাম। কেন লোকটা টাঙায় তুলে আমাকে নিয়ে গেলেন আই-এন-এ অফিসে? অফিসের সেই ভদ্রলোক আমাকে কী-ই বা ঠাউরে ছিলেন, আর গাড়ি ক'রে কেন-ই বা আমাকে নিয়ে গেলেন অচেনা সেই ভদ্রলোক? তারপর আমাকে 'দত্ত' বানিয়ে বিশেষ সমাদরে সেই ভদ্রলোকের আতিথেয়তা—এ সবের কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পেলাম না।

গোল মার্কেট এলো। টাঙা থেকে নেমেই গট্‌গট ক'রে চ'লে যাচ্ছিলাম সেই মেজাজে। খেয়াল হ'লো টাঙার ভাড়া দিইনি। থমকে দাঁড়িয়ে পকেটে হাত দিলাম। সেদিন এই প্রথম পকেটে হাত পড়লো।



আমার একটি পুরনো ফটো-অ্যালবাম আছে। তাতে কিছু ছবি বহুদিন ধ'রেই অতীতের স্মৃতি বহন ক'রে নিয়ে আসছে। সে-সব স্মৃতি একান্তভাবে আমারই। তাই অবসরক্ষণে যখনই সেগুলো দেখতে অ্যালবাম নিয়ে বসেছি, তখনই সুভাষচন্দ্র বসুর এই ফটো দুটি আমার নজরকে যেন বেশী সময় ধ'রে রাখতে চেয়েছে। একটি ছবিতে দেখতে পাই তিনি হেঁটে এগিয়ে আসছেন যুবকদের সঙ্গে, আর অন্যটিতে তিনি একা বসে আছেন—মাথাটা কিঞ্চিৎ নিচু ক'রে।

প্রায় তিন যুগ শেষ হ'য়ে গেলো, এই ছবিগুলো অ্যালবামের পাতায় আবদ্ধ অবস্থায় থেকে আজ ফ্যাকাসে ভাব ধরেছে। কেমন যেন নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে। এ-অবস্থায় ছবি দুটো দেখে যদিও বা অপরের চোখে ত্রুটি ধরা পড়বে, কিন্তু আমার মনের বিচারে একবারও এর মূল্য কমাতে

পারিনি। বরং প্রতিবারই অনুভব করেছি, এই ছবি ছুটোর মূল্য যেন ফিক্সড ডিপোজিটের মতো ক্রমশই বাড়ছে।

আমার এখনো মনে পড়ে, সুভাষ বসু কবে সেই ১৯৪১ সালের জানুয়ারীতে ব্রিটিশের কড়া নজর এড়িয়ে অন্তর্ধান হয়েছিলেন রহস্যজনকভাবে। তারপর অন্য দেশে নেতাজীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'য়ে কীভাবে জাপান-কোহিমা-ইম্ফল রণক্ষেত্রে ইতিহাস রচনা করেছিলেন—সে সব বিস্ময়কর কাহিনী আজ স্বাধীনতার ত্রিশ বছর ধ'রে শুনে আসছি আমরা। সে সব কাহিনীর যেন শেষ নেই, শেষ হবে না কোনোদিনই। নেতাজীর রূপ ও তাঁর ভাবমূর্তি চিরজাগ্রত থাকবে আমাদের মনে।

তবে আমার অ্যালবামের এই ছবি ছুটোতে চোখ পড়লেই অন্য সব স্মৃতি ডিঙ্গিয়ে মনে ভেসে আসে শুধু তাঁর সেই অর্থপূর্ণ এক রসিকতার কথা। ছবি তোলার সেই সুন্দর মুহূর্তের কথা। আর আমার কেন জানি না মনে হয়, কান পাতলে আজো শুনতে পাবো সে কথাগুলো।

আজ আমার সঠিক সময়-কাল মনে নেই। তবে এটুকু আমার স্মরণ আছে যে, তখন তিনি কংগ্রেসের ভেতরেই "ফরোয়ার্ড ব্লক" নামে আর একটি সংগঠন গ'ড়ে তোলার কাজে বিশেষভাবে আন্দোলন করছিলেন। সেই সুবাদেই তিনি গৌহাটি গিয়েছিলেন জনসভা করতে। বিশেষ ক'রে আসামের জনপ্রিয় নেতা তরুণরাম ফুকনের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর আলোচনা হয়েছিলো অনেকক্ষণ ধ'রে।

পত্রিকার জন্য সংবাদ-ছবি তুলতে আমি চ'লে গিয়েছিলাম ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে ওপারে আমিনগাঁও স্টেশন পর্যন্ত। তখন নদীর ওপার থেকে ফেরি-স্টীমারে এপারে পাণ্ডুতে আসতে হ'তো। সেদিন ব্যবস্থা হয়েছিলো, আমিনগাঁও স্টেশন থেকেই এই জনপ্রিয় নেতাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে গৌহাটিতে নিয়ে আসা হবে। সে হিসেবে গৌহাটির নবীন-প্রবীণ বহুজনই, বিশেষ ক'রে ছাত্র মহল, অভ্যর্থনা জানালেন তাঁকে।

এপার থেকে ওপারে যেতে যেটুকু সময় পাওয়া যায়, তারই ভেতর দেখা গেলো সুভাষ বসুকে ঘিরে এক বিশেষ আন্তরিকতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। আমিও যেন একটা ভালো সুযোগ পেলাম। সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে তাঁর কাছে গিয়ে জানালাম—একা একটা ছবি তোলার কথা।

সঙ্গে সঙ্গেই তিনি উঠে এলেন। নিজেই বসলেন এসে একটা ছোট টেবিলে। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন—'এখানে হবে তো?'

আমি না বলিনি।

কিন্তু ফোকাস করতে গিয়ে খেয়াল করলাম, তাঁর পুরু লেন্সের চশমায় অত্যধিক reflection আসছে। এতে ছবিটা ভালো লাগবে না। মনে একটু খুঁত খুঁত নিয়ে অগত্যা তাঁকে জানালাম আমার সমস্যার কথা। তিনি বুঝলেন এবং জানতে চাইলেন—'এজন্য আমাকে কী করতে হবে?

আমি বললাম—'আপনাকে শুধু মাথাটা একটু নোয়াতে হবে।'

অমনি সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিলেন—'আমি কারো কাছে মাথা নোয়াই না।'

কথাটা কিন্তু বেশ গম্ভীর মেজাজে ব'লেও তিনি শেষ পর্যন্ত সেটা বজায় রাখতে পারেন নি শুধু আমাদের সবাইর হাসির জন্য। দেখা গেলো তিনিও হাসছেন মুখ চেপে।

*

তারপর থেকে ভারতের ইতিহাসে কত পৃষ্ঠা যে রক্তাক্ষরে লিখিত হয়েছে এই বীর সন্তানের কথা, তার ইয়ত্তা নেই। আজ অবধি আমরা জানি না তিনি কোথাও, কোনো কারণে মাথা নত করেছিলেন কিনা। কিন্তু আমরা তাঁকে অন্তরের গভীরতম শ্রদ্ধা জানাতে চিরদিনই নতমস্তকে থাকবো। কারণ নেতাজী সুভাষচন্দ্র ভারতবাসীর কাছে চিরসত্য।



কথায় বলে লাট। সেই লাটের আদেশ অমান্য ক'রে কোনো সরকারী কর্মচারী তার পরেও বহাল-তবিয়তে থাকতে পারে, এমন কথা চিন্তা করা একটু কঠিন। তবে সেটা আমি নিজেই করেছিলাম এবং তার পরেও যে সসম্মানে কাজে নিযুক্ত ছিলাম, সে কথা আজ এখানে লিখতে পারছি। বলতে পারছি সেই কাহিনী।

একজন সরকারী কর্মচারী হিসেবে আমার পক্ষে এটা অবশ্যই একটি স্মরণীয় স্মৃতি-কথা। সেই স্মৃতি ফিরে আসে যখনি পশ্চিবঙ্গের প্রথম লাট-সাহেব রাজাজীর এই ছবিখানা দেখি। মনে প'ড়ে যায় তাঁর সেই আদেশের কথা।

সেটা ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসের কথা। তখন লাটসাহেব জেলা পরিদর্শনে যেতেন মাঝে মাঝে তাঁর স্পেশাল ট্রেনে ক'রে পুরোপুরি ব্রিটিশের কায়দায়। হ'তে পারে খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত লাঠি হাতে বৃদ্ধ এক ভারতীয় লাট—তবুও তিনি মর্যাদায় সমকক্ষ ছিলেন সেই আমাদের ছেড়ে-যাওয়া মনিবদের মতোই। লাটের মর্যাদা রক্ষার কল্পে রেলের প্ল্যাটফর্মে থাকতো বিস্তৃত লাল-সালু, চতুর্দিক কর্ডন ক'রে রাখতো সতর্ক পুলিসবাহিনী, আর অতি বিনয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন রেল স্টেশনের কর্মচারীবৃন্দ। ওদিকে লাট ভবনের অন্দরমহলের কর্মচারীরা বহির্জগতে ভ্রমণের আনন্দে যোগদান করতেন, আর থাকতেন কিছু ভিন্ন মহলের সরকারী অফিসার। এ-সব পাঁচমিশেলীর ভেতর প্রচার দফতর থেকে 'অফিসিয়াল ফটোগ্রাফার' হিসেবে থাকতাম আমি।

তেমনি এক স্পেশাল ব্যাপারে লাটসাহেব রাজাজী গিয়েছেন মুর্শিদাবাদ সফরে। সেদিন সকালের দিকে যথারীতি মুর্শিদকুলি খাঁর স্মৃতিশৌধ এবং তৎকালীন নবাবদের কবরখানা পরিদর্শন ক'রে এসেছেন নসীবপুরে জগৎ শেঠের বাড়িতে।

তখনকার দিনে ক্যামেরায় ফ্ল্যাশ-আলোর ব্যবস্থায় কিছু জটিলতা ছিলো। ফ্ল্যাশ পৃথকভাবে হাতে ক'রে জ্বালাতে হতো ব'লে ওটা খুব কমই ব্যবহার করা হ'তো। আমিও সেদিন ঘরের ভেতর ভিড়ের ঝামেলা এড়িয়ে বাইরে এসে আপন মনে দাঁড়িয়ে আছি। তখনি কে একজন ছুটে এসে জানালো, লাটসাহেব ছবি তোলার জন্য আমাকে ডাকছেন ভেতরে।

ভেতরে যেতেই রাজাজী বললেন—'শোনো, এই মুক্তাখচিত

কাপড়টি বিশেষ মূল্যবান। আমি এর একটা ছবি চাই, যেভাবে হাতে নিয়ে দেখছি এখন।'

আমি সঙ্গে সঙ্গেই সম্মতি জানিয়ে ক্যামেরা 'ট্রাইপডে' লাগিয়ে নিলাম, আর হাতে তুলে নিলাম ফ্ল্যাশের আলো। তখন ফ্ল্যাশে ওভাবে ছবি তুলতে ক্যামেরায় দীর্ঘ-সময় এক্সপোজার দিয়ে তারই মাঝখানে হাতের ফ্ল্যাশ টিপে দিতে হ'তো। আমিও ঠিক তাই করলাম। ছবি আমার হিসেবে ঠিকই তোলা হলো। কিন্তু লাটসাহেব কেন জানি সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি বললেন—'তোমার ও-ছবি মনে হয় নষ্ট হ'য়ে গেছে। তুমি বরং আবার ছবি নাও।'

আমি সঙ্গে সঙ্গেই জানালাম—'না, ছবি তোলা ঠিকই হয়েছে।'

তবুও আবার লাটের আদেশ হ'লো—'আমার মনে হয় না ওটা ঠিক হয়েছে। তুমি আর একটা ছবি তোলো।'

কিন্তু আমি কেন জানি না আবার আগের মতোই তাঁর আদেশ মানতে রাজী না হ'য়ে সবিনয়ে বললাম—'না স্যার, আমি জানি ওটা ঠিকই হবে।'

এবার লাটসাহেব বেশ একটু নিরাশ হ'য়ে বললেন—'আচ্ছা, তা হ'লে ঠিক আছে।' কথায় তাঁর ক্ষুণ্ণ মনের কিঞ্চিৎ আভাস যেন পেলাম।

তারপর আমি চ'লে এলাম বাইরে। আসা মাত্রই আমাকে সবাই বোঝাতে লাগলেন, আমি কতদূর মারাত্মক অন্যায় করেছি লাট-সাহেবের আদেশ মতো ছবি তুলতে অস্বীকার ক'রে। উগ্র-ধাঁচের কেউ বললেন, যদি লাটসাহেব চান, তা হ'লে একটা কেন, একশোটা ছবি তুলবেন। আর এখানে তিনি হুকুম করছেন মাত্র একটা ছবি তুলতে, তা আপনি কিনা সেটা অমান্য করলেন ?

এতোখানি পরেও আমি সবাইকে খুবই বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে, ছবি তোলায় আমার ত্রুটি কোথায় হয়েছে সেটা যদি আমি নিজেই বুঝে উঠতে না পারি, তা হ'লে তো একই ত্রুটি আবার হবে। সুতরাং

আবার ছবি তুলে লাভ কী ?

কে যেন একজন ব'লে উঠলেন—'মশাই লাভ কিছু নয়, কিন্তু ক্ষতিটা কোথায় ?'

তখন লাটসাহেবের সেক্রেটারী ছিলেন বি, এন্, চক্রবর্তী। তিনি খুব ঠাণ্ডা মেজাজে আমাকে বোঝালেন—'আর একটা ছবি তুললেই পারতেন।'

যাইহোক, এভাবেই সেই পর্ব সেখানে শেষ হ'লো। কিন্তু আমার শুরু হ'লো এক নতুন চিন্তা। সেই চিন্তা ক্রমেই পরিণত হ'লো এক দুশ্চিন্তায়। যার জন্য কলকাতা ফিরবার পথে সারাটা রাত ট্রেনে ঘুমোতে পর্যন্ত পারিনি। মনে তখন নানা কথা এসে অশান্তির জটলা পাকাচ্ছে। শুধু মনে হ'তে লাগলো, যদি ফিল্মটা ডেভেলপ করার সময় বা অন্য কোনো কারণে নষ্ট হ'য়ে যায়, তা হ'লে ? তখন কি এই ডেভেলপের বা অন্য কোনো অজুহাত দিয়ে আমার অপরাধ চাপা দেওয়া যাবে ? রাজভবনে যখন ছবি যাবে, তখন লাটের সেই আকাঙ্ক্ষিত ছবি না পেলে তারপর কি অবস্থা হবে, তা আমি নিশ্চিতভাবেই বুঝতে পেরেছিলাম। তা হোক, চাকরি যায় যাবে। চাকরির প্রশ্নটাই সেখানে আমার কাছে ততখানি বড়ো ছিলো না, যতটা ছিলো পরাজিত হবার প্রশ্ন। এভাবেই নানা চিন্তায় ঘুম আর হ'লো না।

শিয়ালদহে স্পেশাল থামলো ভোরবেলা।

আমি যত সত্বর সম্ভব ফিল্মটা ল্যাবরেটরীতে ডেভেলপ ক'রে আলো জ্বেলে সেই বিশেষ নেগেটিভটার দিকে তাকাতেই মনটা আমার আনন্দে নেচে উঠলো। ভুলে গেলাম সেই মুহূর্তে আমার রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি, মন থেকে চ'লে গেলো সেই অশান্তিকর আশঙ্কা। পরিবর্তে বরং গর্বিত হলাম আমি রণ-বিজয়ী এক বীরের মতো। আমার ছবি ঠিক আছে। আমার কথার মূল্য আছে।

সেইদিনই মুর্শিদাবাদের অন্যান্য ছবির সঙ্গে এ-ছবিটি ইচ্ছে ক'রেই

একটু বড় সাইজের এনলার্জ ক'রে পাঠিয়ে দেওয়া হ'লো লাটভবনে রাজাজীর কাছে। আমি নিশ্চিত ছিলাম, আর কেউ না বুঝলেও যার বুঝবার তিনি ঠিকই বুঝে নেবেন—কেন ও-ছবিটা একটু বেশী বড় করা হয়েছে। আমার এই নীরব-জবাব বিশেষ কাজ করেছিলো, এবং তার আভাস আমি পেয়েছিলাম পরবর্তী সময়ে। সমাদর পেয়েছিলাম রাজাজীর কাছে।

*

ভারতের ইতিহাসে অতি বিচক্ষণ ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে যিনি চিরদিন পরিচিত হ'য়ে এসেছেন, তাঁর সেদিনকার বিচার-বিবেচনায়ও কিছুমাত্র ভুল-ত্রুটি ছিলো না। বরং যে-বিষয়টি লক্ষ্য ক'রে তিনি আমাকে দ্বিতীয়বার ছবি তুলতে বলেছিলেন, সেটি তাঁর তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রমাণই দিয়েছিলো শুধু। কারণ, তখন ছবি তুলতে আমার ফ্ল্যাশ জ্বালাবার পরেও, ক্যামেরার শাটারে একটা শব্দ শোনা যেতো। যে-জন্য তিনি সেটাকেই ধ'রে নিয়েছিলেন, শাটার দেরীতে কাজ করেছে ব'লে। আসলে ফ্ল্যাশটাই যে এক্সপোজারের কাজ করে—সেটা সকলের জানবার কথা নয়। তাই, সেদিনকার ছবি তোলার ব্যাপারে অত সব ঘটেছিলো শুধু একটা ভুল বোঝাবুঝির জন্য। কিন্তু ভুল ছিলো না কোথাও। আমারও না, লাটসাহেবেরও না।



প্রায় সাড়ে-তিন ফুটের মতো লম্বা। নাম কানাইয়া।

মথুরা-বৃন্দাবনকে লীলাক্ষেত্র ক'রে যে-কানাই শত-সহস্রজনের মনে স্থান পেয়েছিলো অবলীলাক্রমে, তার তুলনায় মণিপুরের কানাই অন্তত কিছু লোকের মনে স্থান ক'রে নিয়েছিলো তাতে সন্দেহ নেই। স্থান

সে পেয়েছিলো আমার মনেও। তাই আজ দীর্ঘ ২৮ বৎসর পরেও এই ছবিখানা আমার মনকে অনায়াসে টেনে নিয়ে যায় মণিপুরের সেই সময়কার পরিবেশে। স্মৃতিপটে যেন দেখতে পাই কানাইয়াকে আমাদের নিত্য সহচর রূপে।

তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের হামলা-ঝামেলা থেমে গেছে। অবসান ঘটেছে মণিপুর-কোহিমার রণাঙ্গনের ভয়াবহ রূপের। সবাই যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সন্ধান করছে একটু সুস্থ আবহাওয়ার। এ-সময় আমরা চারজনের একটি দল মতলব এঁটেছিলাম মণিপুর যাবার জন্য। এই ভ্রমণ পর্বের জৌলুস বাড়িয়ে দিতে বহু আকাঙ্ক্ষিত 'চিত্রাঙ্গদার দেশ' দেখার সঙ্গে অতিরিক্ত আকর্ষণ হিসেবে হাতে নিয়েছিলাম মণিপুরের একটি ডকুমেণ্টারী ফিল্ম তোলার দায়িত্ব। ফিল্ম তুলবো, আর দেশ দেখবো। আমরা মহাখুশী হলাম রথ দেখা আর কলা বেচার আনন্দে।

সমস্ত আয়োজন ঠিকঠাক্ ক'রে পুজোর ছুটির মুখেই আমরা রওয়ানা হয়েছিলাম। ডিমাপুর-কোহিমা-ইমফলের দীর্ঘ পথের দুধারে তখনো যুদ্ধ-তাণ্ডবের নিদর্শনের ছড়াছড়ি, আর আকাশে-বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে বারুদের গন্ধ। আমরা ইমফলে গিয়ে উঠেছিলাম এক হোটেলে। তখন অনেক রাত হ'য়ে গিয়েছিলো। সারাদিনের পথ-ভ্রমণে পরিশ্রান্ত সবাই।

প্রথম রাতের পুরো ঘুমের পর ভোরবেলায় বিছানার পাশেই গরম চা দিয়ে গেলো হোটেলের ছেলেটা। শুয়ে শুয়ে একটু আমেজের মুখে মণিপুরের কথা চিন্তা করছিলাম মাত্র, তখনি ঘরের ভেতর এসে খট্ শব্দ ক'রে মিলিটারী কায়দায় এক সেলাম জানালো এই কানাইয়া। হোটেলের ঠাকুর এসেছিলো সঙ্গে, পরিচয় করিয়ে দিয়ে ব'লে গেলো, আপনাদের খুব কাজে লাগবে এই মিনি-সৈনিকটিকে। সারাদিনই ও থাকবে আপনাদের সঙ্গে, যে কাজ বলবেন তাই করবে। সেই থেকেই যে কয়েকদিন ছিলাম, সর্বক্ষণ আমাদের সহচর হ'য়ে কানাইয়া ঘুরে

বেড়িয়েছে আমার ক্যামেরার ব্যাগ কাঁধে ব'য়ে। দিনের শেষে হোটেলে ফিরে এসেই মিনি-সৈনিক সেলাম জানাতো খট্ ক'রে, আর আমরা তার হাতে তুলে দিতাম নগদ দুটো টাকা।

আমার আজো মনে আছে, প্রথম দর্শনের দিনই কানাইয়া আমার বিশেষ কৌতূহলের বস্তু হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলো। সেদিন তার পোশাকে ছিলো পুরোদস্তুর আমেরিকার সৈনিক ইয়াঙ্কীর ছাপ। আমি প্রবল আগ্রহ নিয়ে ওর ভাবসাবগুলো লক্ষ্য করছিলাম। দেখছিলাম পুরোপুরি একটি লোকের নিখুঁত ক্ষুদে সংস্করণ। যেন কেষ্টনগরের ঘুর্ণীর মৃৎশিল্পীদের হাতের তৈরি কোনো পুতুল দেখছি। পুতুলের ভেতর কল-কৌশলে যেন হাত-পা, চোখ-মুখ নড়ছে, কিন্তু কথা বলছে না। ভাবছিলাম, ও কোন্ ভাষায় কথা বলে। আমাদের বাংলা, হিন্দি কিংবা অসমীয়া বুঝবে কিনা। তখন ঠাকুরের কাছেই জানতে পারলাম কানাইয়ার মুখে কোনো ভাষাই ফোটেনি আজ পর্যন্ত। কানাইয়া বোবা।

ভগবান বুঝে-সুঝেই ঘাটতি পূরণ করতে বুদ্ধির 'কোটা' বোবাকে একটু বেশী পরিমাণেই দিয়ে থাকেন। সেই সুবাদে কানাইয়াকে মনে হ'লো অতি তুখোড়। দারুণ চালু। খুব সহজেই ও নিজেকে আমাদের কাছে অপরিহার্য ক'রে তুললো। স্রেফ ইশারায় কাজ করতো। দাঁড়ালেই বুঝতে পারতো। সিগারেট বের করলেই লাইটার জ্বালিয়ে ধরতো মুখের কাছে। অনেক সময় ওর সিগারেটই তুলে দিতো আমাদের হাতে। তাছাড়া মণিপুরী নৃত্যের ছন্দ উপেক্ষা ক'রে কানাইয়া নানা সময়ে তার একক-নৃত্যনাট্যের ভঙ্গীতে যেসব কাহিনী পেশ করতো, তাতেই আমরা বুঝেছিলাম যুদ্ধের সময় আমেরিকানদের বহু কাজে তার সাহায্য নেওয়া হয়েছিলো। তখন যুদ্ধের সময় ঐ-সব দীর্ঘ দেহী আমেরিকানদের পক্ষে কানাইয়া অনেকটা পকেট-এডিশনের কাজ করেছে। ওরকম পাকা-মগজের পোর্টেবল্ মানুষটি ওদের কাছে নিশ্চয়ই দুর্লভ সম্পদ বিশেষ ছিলো।

ইমফলে আমাদের মাঝে মাঝে যে-জন্য একটু খারাপ লাগতো, সেটা ছিলো শুধু কানাইয়ার সঙ্গে প্রাণ খুলে ছুটি কথা বলতে পারতাম না ব'লে। এদিকে বঞ্চিত হ'য়ে তার ব্যক্তিগত জীবনের কোনো কথাই জানবার সুযোগ পাইনি। আমাদের সঙ্গে ইমফলের পথে-ঘাটে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে ঠিক যন্ত্রের মতোই। ওর প্রাণের আভাস পেতাম না। কিন্তু ফিরবার আগের দিন পথে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ এক সময় আমরা খেয়াল করলাম—কানাইয়া আমাদেরই একটু আগে আগে যাচ্ছে, আর মুখে 'ফাই—ফাই—ফাই' গোছের একটা আওয়াজ করছে হাত নেড়ে নেড়ে। বেশ কৌতূহল হ'লো আমাদের। একটু বুঝতে চেষ্টা করার পর এক বন্ধু বললো, ওটা নিশ্চয় কোনো প্রেমের গান। কথাটা তখন মেনে নিলাম, কারণ প্রেমহীন কানাই এদেশে চলবে না।

ইমফলে আমাদের ছিলো দিন সাতেকের পালা। দেখতে দেখতে যেন চোখের সম্মুখ থেকে মুছে গেলো বর্ণসৌন্দর্যে রূপায়িত রাসনৃত্য, আর মিশে গেলো বাতাসে মৃদঙ্গ-তরঙ্গের মুখরিত ধ্বনি।

ফিরবার দিন কানাইয়া এসে বিমর্ষ মুখে দাঁড়িয়ে রইলো। আমাদেরও খারাপ লাগছিলো ওকে ছেড়ে আসতে। ভাবলাম এজন্যই বোধ হয় কাল থেকে ওর মনে উদাসীন ভাব জেগেছে। আমি পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বের ক'রে ওকে দিলাম। ও নিলো হাত পেতেই, আর তেমনি বিমর্ষভাবে চ'লে গেলো হোটেল ছেড়ে। একটা সেলাম পর্যন্ত দিলো না।

এবার রান্নার ঠাকুর ঘরে এলো। তাকেও বখশিস দিলাম। তখনই একটু দুঃখ ক'রে বললাম বেচারা কানাইয়ার কথা। কিন্তু ঠাকুর একগাল হেসে বললো,—'তা আপনারা এতো কথা ভাবছেন বাবু! আসলে হয়েছে কি, কাল ও বউর হাতে আচ্ছা ঠ্যাঙ্গানী খেয়েছে বলেই আজ টাকা নিয়ে সোজা চ'লে গেছে বাড়ি। বউটা তো কাজ ক'রে ওকেই খাওয়ায়। আর ওটা মাঝে মাঝে মদ-ফদ খেয়ে বাড়ি ফেরে।

যাক ছেড়ে দিন ওর কথা।' তারপর আর কিছু বলিনি আমরা।

দীর্ঘ পথ বাসের ভেতর ব'সে ব'সে আমরা কানাইয়ার প্রসঙ্গ তুলেছি বহুবার। কিন্তু প্রতিবারই আমাদের কল্পিত প্রসঙ্গের আলোচনা অসমাপ্তভাবেই শেষ হ'য়ে গেছে। আবার তুলেছি সম্ভাব্য নতুন প্রসঙ্গ। এভাবেই কানাইয়া আমাদের মনের ভেতর একটা অসমাপ্ত রূপ নিয়ে শেষ পর্যন্ত থেকে গেছে ঠিকই। আমাদের কাছে ওর স্মৃতি অনেকটা অম্ল-মধুর। তবে আমাদের চিরদিনের আফসোস থেকে গেছে যে, কানাইয়ার কথা এতোখানি জেনেও তার নিজের মুখ থেকে কিছুই জানতে পারিনি আমরা।



এখানে আমার বেশী আগ্রহ ছিলো দেবিকারাণীর ছবি তোলার। তখন তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁর স্বামী রোয়েরিখ্ আর ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে। খুশ মেজাজে কথাবার্তা বলছিলেন ওঁরা। আমি কাছে এগিয়ে ক্যামেরা তুলে ধরতেই, দেবিকারাণী যেন কিছু বললেন আমাকে। কিন্তু তাঁর কথায় তখন কান না দিয়েই ছবিটা চট্ ক'রে তুলে নিলাম আগে। কারণ আমার সন্দেহ ছিলো, পাছে তিনি ছবি তোলায় আপত্তি করেন!

কালিম্পঙয়ে এক বৈকালিক চা-এর মজলিসে আমি উপস্থিত হয়েছি। সেখানে অতি বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নেহরু এবং মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার রায়। আরো কারা কারা রয়েছেন যেন। মনে আছে, সেদিন ওখানে গিয়ে দেবিকারাণীকে প্রথম চাক্ষুস দর্শনের পর, আর কাউকে কেন জানি না তেমন খেয়াল করিনি। দূর থেকে দেবিকারাণীকে দেখে তাঁর দিকেই ক্রমশ এগিয়ে গেলাম।

কয়েক সেকেণ্ড মাত্র দাঁড়িয়ে ছিলাম। তার পরই তুলে ধরলাম ক্যামেরাটা।

দেবিকারাণীকে দেখার আগ্রহ বহুজনের মতো আমারও ছিলো বৈকি! সিনেমা জগতের প্রথম যুগেই অভিনয়ে শীর্ষ স্থান অধিকার করেছিলেন, যিনি সেই গান 'বন্‌কে চিড়িয়া বন্‌মে বন্‌বন্‌' সকলের মুখে তুলে দিয়ে মন মাতিয়েছিলেন—তাঁকে এতোদিন পর স্বচক্ষে দেখার সুযোগ পেয়ে এতোটা আগ্রহ হওয়াই স্বাভাবিক। বিধাতা তাঁকে যতখানি রূপ আর গুণ দিয়েছিলেন, ততখানি শিক্ষা আর যশ-মর্যাদার অধিকারীও ছিলেন তিনি। একটি ধারায় নেহরু যেমন সম্মানশীর্ষে, অপর একটি ধারায় দেবিকারাণী শ্রেষ্ঠ আসনে।

ওঁরা তিনজন তখন হালকা-হাসির কথায় খুশ মেজাজী। কিছুটা সংযত হলেন আমি ক্যামেরা তুলে ধরতেই। রোয়েরিখ্‌ স্থিরভাবে তাকিয়ে রইলেন ক্যামেরার দিকে।

রোয়েরিখ্‌ আর দেবিকারাণী। একজন রুশজাত প্রখ্যাত চিত্র-শিল্পী, আর অপরজন ভারতের রূপ-গুণ-যশ সম্পন্না মহিলা। এঁদের দুজনের সূক্ষ্ম অনুভূতিসমৃদ্ধ মন ছিলো ব'লেই হয় তো এঁরা এক সুরে মিলিত হবার পথ খুঁজে নিয়েছিলেন। এখানে রুশ-বঙ্গ প্রশ্নকে দূরে সরিয়ে রেখে, চিরন্তন সত্যকে মেনে নিয়ে দুটি প্রাণী মধুরতম জীবন যাপনে ব্রতী হয়েছেন। এঁরা কখনো বা কুলু-কাঙড়ার সৌন্দর্যময় প্রকৃতির কোলে ব'সে থাকেন স্নিগ্ধ-মধুর উপত্যকায়, আবার কখনো বা চ'লে আসেন তিব্বতী সৌন্দর্যের রূপময় পরিবেশে—কালিম্‌-পঙয়ের আঙিনায়।

ছবি তুলেই ক্যামেরা নামালাম চোখ থেকে। তখনো দেখছি দেবিকারাণী যেন আমাকে কি বলছেন। আমি তো তাঁরই দিকে তাকিয়ে রয়েছি, কিন্তু কোনো জবাব দিচ্ছি না।

এবার তিনিই একটু এগিয়ে এলেন এবং সরাসরি প্রশ্ন করলেন—'ইউ স্পীক্‌ বেঙ্গলী? আপনি বাংলা বলেন?'

বুঝলাম তিনি আগের কথার জবাব পাননি ব'লে, কোন্ ভাষায় কথার জবাব পাবেন তাই জানতে চাইছেন। আমি এবার খুশীমনেই বাংলাতে জবাব দিলাম—'বলুন, কী বলবেন।'

—'না শুনুন, আমি বলছিলাম কি, নেহরুর 'প্রোফিল'টা ভারী সুন্দর। কিন্তু সবাই দেখেছি ছবি তোলে তাঁর মুখোমুখি। তাই আমি আপনাকে বলছি—আপনি একটা প্রোফিল তুলুন।'

কিন্তু আমার কথা অন্য রকম। আমি বলি—'দেখুন, নেহরুর সব রকমের ছবিই আমার তোলা হ'য়ে গেছে। কিন্তু আপনার ছবি তো একটিও তুলিনি। আজ ভাবছি শুধু আপনারই ছবি তুলবো।'

আমার কথায় বোধহয় একটু আব্দারের আভাস ছিলো। তাই তিনি হাসিমুখেই মেনে নিলেন। বললেন—'আচ্ছা সেটা হবে, তবে একা নয়। আমার স্বামীর সঙ্গে।'

আমি তো আরো খুশী!

কিন্তু আবার সেই প্রোফিল-প্রসঙ্গ তুলে তিনি নেহরুর দিকে দেখিয়ে আমাকে ছবি তোলার কথা বলতে লাগলেন। আমি তাকিয়ে দেখি, নেহরু চা-এর কাপ হাতে তাকিয়ে আছেন উৎসুকভরে আমাদেরই দিকে। আমি লজ্জিত বোধ করলাম, কিন্তু দেবিকারাণী রসিকতা ক'রে হেসে-হেসে এদিক থেকে বললেন—'আমি এর সঙ্গে বাংলা বলছি।'

বাংলা ভাষা, নেহরু ঠিক বুঝতে পারলেন না। তাই প্রশ্ন এলো—'হোয়াট্, হোয়াট্?'

তবুও দেবিকারাণীর সেই জবাব—'আমি বাংলায় কথা বলছি।'

এটা নিঃসন্দেহে একটা অস্বস্তিকর ব্যাপার। তবে এ-শুধু নেহরুর স্নেহধন্যা দেবিকারাণীর পক্ষেই সম্ভব ছিলো। অবশ্য দেবিকারাণী তখুনি কাছে গিয়া ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন, আর সঙ্গে সঙ্গেই এক প্রাণখোলা হাসি ছড়িয়ে পড়লো ঐ পরিবেশে। মজলিসের অনেকেই বুঝলেন না কীসের এতো হাসি!

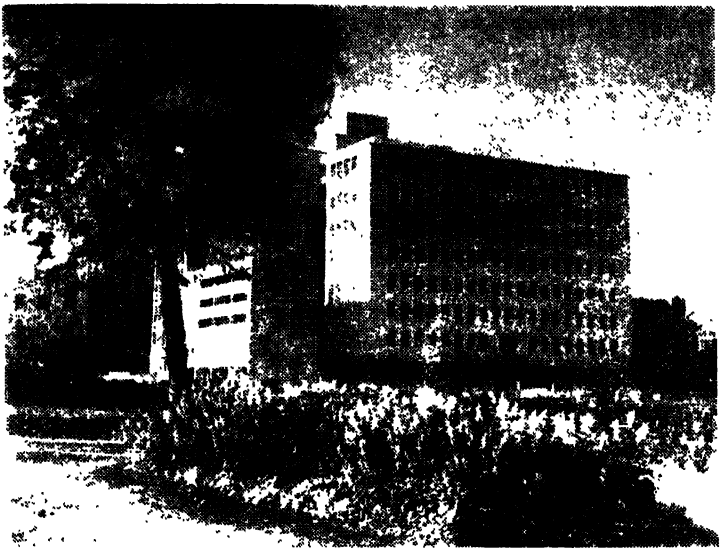
কিছু পরেই আবার এগিয়ে এলেন দেবিকারাণী।

এবার তাঁকে দু' একটি প্রশ্ন করি তাঁর সিনেমা জগতের প্রসঙ্গে। ক্ষণিকের জন্য তিনি যেন আনমনা হলেন। আমার কথাগুলোর জবাব না দিয়ে তাকিয়ে রইলেন দূর-দিগন্তের পর্বতমালার দিকে। মুখ ফিরিয়ে একটু লজ্জিত হলেন তাঁর আনমনা ভাবের জন্য। স্মিত-হাসিতে শুধু বললেন—'আপনার কথাগুলো খুব ভালো—মনে লাগে।'

প্রশংসা শুনেও আমি চুপ ক'রে আছি। তিনিই আবার বললেন—'চলুন এবার ছবি তুলবেন। আপনিই আমার স্বামীকে বলুন ছবি তোলার কথা। উনি খুশী হবেন।

*

এ-ছবি প্রায় পঁচিশ বছর আগের। তবুও দেখলে আমার মনে হয় সেদিনের ব্যাপার ব'লে। দেবিকারাণীকে যেন দেখতে পাই তেমনি আমার সম্মুখে, কানে যেন স্পষ্ট ভেসে আসে তাঁর ঐসব কথাগুলো। কিন্তু তখুনি মনে হয়—আমার মনোমতো ছবি সেদিন পেতে গিয়ে তাঁর মনোমতো ছবির কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। সেদিন নেহরুর 'প্রোফিল' তুলিনি।



কলকাতার ডালহৌসী স্কোয়ারের ভেতরে তোলা এই ছবি। বেশ কিছু কাল আগে পর্যন্ত এই চত্বরটি যেমনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতো, তেমনি থাকতো সুন্দর আকর্ষণীয় পরিবেশ নিয়ে। তবে আজ এ-ছবি হাতে নিয়ে বর্তমানের রূপের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে গেলে সেটা হবে অনেকটা বিগত যৌবনা এক শাশুড়ীর তাঁর নববধূ বেশের ফটোগ্রাফে অতীত-স্মৃতির সন্ধান করার সামিল। শাশুড়ীও যে একদিন বধূ ছিলেন, সে-কথা মনে টেনে এনে শুধু আফসোসকেই ডেকে আনা হবে। ব্যথা-যন্ত্রণা হবে বুকের ভেতরে। তখনকার রঙীন স্মৃতি ভেসে আসবে ঝাপসা-ধূসর হ'য়ে। তেমনি আজ আমি এ-ছবিখানা হাতে তুলে নিয়ে পরিষ্কার অনুভব করতে পারি—কীভাবে কালের স্রোত সৌন্দর্যকে টেনে নিয়ে চ'লে যেতে পারে অবলীলাক্রমে!

ডালহৌসী স্কোয়ারের ভেতরে তখন সবেমাত্র এই টেলিফোন

ভবনটি জাকিয়ে বসেছে, আর তারই আশেপাশে রচিত হয়েছে মরসুমী ফুলের বাগিচা। রূপ চর্চায় দক্ষ হাতের স্পর্শে গোটা এলাকাটাই হ'য়ে উঠেছে যেন সকলের দৃষ্টিতে আকর্ষণীয়। আমরা তখন ভাবলাম আমাদের লাল-দীঘির সময়টা ভালো যাচ্ছে। কিন্তু হায়! ভালো সময় কখনো বেশীদিন থাকে না বলেই বোধ করি, ক্রমে ক্রমে নানা পরিবর্তন এসে সেই ডালহৌসী স্কোয়ারের সৌন্দর্যকে এমনই এক পর্যায়ে রূপান্তরিত করলো, যেখানে অতীতের কথা শুধু হ'য়ে রইলো কাহিনী।

কলকাতার ইংরেজরা, এক কালে যার পোশাকী নামে 'মারকুইস অব ডালহৌসীর' বন্দনা করেছিলেন, বাঙালীরা তাকেই ভালোবাসার আন্তরিকতায় আটপৌরে নামে ডাকতেন 'লাল-দীঘি' ব'লে। এখানে বিলিতি-দেশী মিশ্রণে একটিমাত্র মেজাজ খুঁজে ছিলেন সবাই। এবং সেটাই ছিলো সৌন্দর্যময় কলকাতা। তাঁরা চেয়েছিলেন জনজীবনে রুচিবোধ জাগিয়ে তুলতে, তেমনি আবার সজাগ থাকতেন মেজাজ আর মর্যাদা নিয়ে। না-হ'লে একটুখানি তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, কতখানি গুরুত্ব নিয়ে রচিত হয়েছিলো রাজভবন আর রাইটার্স বিল্ডিংস-এর মধ্য এলাকায় এই লাল-দীঘি। তখন দীঘির নীল জলে রঙ বেরঙের ছায়া পড়তো, চতুষ্পার্শে বিছানো থাকতো সবুজ ঘাসের গালিচা আর তারই স্থানে স্থানে ছড়িয়ে থাকতো রকমারী ফুলের সমারোহ। সকলেরই মনে এনে দিতো প্রকৃতির পরিবেশে মুক্ত হাওয়ার অনুভূতি।

এখানেই সন্ধান ক'রে একটি ঐতিহাসিক মেজাজেরও রেশ খুঁজে পাওয়া যেতো তখন। রাজভবনের সিংহাসন-কক্ষ থেকে সরাসরি, এই লাল-দীঘির ওপর দিয়েই, রাইটার্স বিল্ডিংস-এর মুখ্যমন্ত্রীর কক্ষ বরাবর বাধাহীন দৃষ্টি বিনিময়ের সুযোগ তৈরি হয়েছিলো। তখন ইচ্ছে করলেই লাটসাহেব চোখ মেলে সরাসরি দেখতে পেতেন মুখ্যমন্ত্রীর ঘর। এমন একটি বিশেষ ব্যবস্থা ইংরেজ রাজত্বে বা রাজনীতিতে

কতখানি তাৎপর্যপূর্ণ ছিলো, সে কথা আমার কোনো দিনই মনে আসেনি। আমি শুধু রাজভবনের ঐ সিংহাসন কক্ষে দাঁড়িয়ে মনে মনে এগুলো কল্পনা করেছি, আর প্রাণ ভ'রে তারিফ করেছি এমন একটি মূল্যবান মেজাজের। তখন মনে হয়েছে, এ-মেজাজের মূল্য দিতে যেন শত সহস্র হীরা-পান্না-চুণীতেও কুলিয়ে ওঠা যাবে না।

এতো সুন্দর মেজাজটুকু, হারিয়ে গেলো বললে ঠিক হবে না, বরং বলা চলে সেটাকে বধ করা হ'লো লাল-দীঘির দক্ষিণে এই টেলিফোন ভবনকে আশ্রয় দিয়ে। সেই সর্বপ্রথম ডালহৌসী স্কোয়ারের কৌলীন্য ভঙ্গ হ'লো। ফলে, দক্ষিণের হাওয়াটুকু পর্যন্ত বাধা পেলো ব'য়ে যেতে। তারপর যা হ'য়ে থাকে, একবার ভঙ্গ হ'লে বহু ভঙ্গে আপত্তি আসে না, এবং ক্রমশ অসবর্ণে প্রবেশ করতেও অসুবিধা হয় না বিশেষ।

ঠিক তাই হ'লো। ভালো মন্দের বাছ-বিচারগুলো আর রইলো না। অবশেষে দেখা গেলো একদিন কলকাতার রাজপথের ট্রাম পর্যন্ত এসে প্রবেশ করেছে বনেদী ডালহৌসীর অন্দর মহলে। সুযোগ বুঝে একে একে বহু বর্ণের অনুপ্রবেশে ডালহৌসী স্কোয়ারের ভেতরে মেলা ব'সে গেলো।

আমাদের সামাজিক জীবনে যতগুলো ধোঁকা স্বীকৃতিলাভ করেছে, তার ভেতর 'এফিডেভিট' একটি দারুণ বস্তু। মাত্র পাঁচ-দশ টাকায় কিস্তিমাত করতে—রামকে রহিম, স্ট্রীটকে সরণী, এটাকে সেটা বানিয়ে দিতে—এর মতো সহজ পন্থা আর কিছুতেই নেই। আমাদের এই অভিনব পন্থাতেই ডালহৌসী স্কোয়ারকে তুলে ফেলে দিয়ে বসিয়ে দেওয়া হ'লো বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ-কে। পবিত্র ব'লে গণ্য হ'লো এই ভূমিখণ্ড তিন বাঙালী বিপ্লবীর স্মৃতিতে। স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বসানো হ'লো যাত্রার আসর। তারপর থেকেই মেলাকে আরও জম-জমাট ক'রে তুললো অঙ্গনে ট্যাক্সি আর মিনি-বাসকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে।

অতীতের এ-ছবি বর্তমানের সঙ্গে মেলাতে গিয়ে হতাশার মাত্রাই বৃদ্ধি পাবে শুধু। না-হ'লে, মহানগরীর প্রাণ চঞ্চল অফিস এলাকার এই ডালহৌসী স্কোয়ারেও একদিন ছয় ঋতুর সন্ধান মিলতো। বিশেষ ক'রে ছুটির দিনের অবসরক্ষণে এখানে এলে, শান্ত-নিঝুম পরিবেশে ঋতুর পরিবর্তন চোখে ধরা দিতো। মনে যথেষ্ট শান্তি এনে দিতে পারতো বৈকি! এ-ভাবেই একদিন যেখানে প্রকৃতির রূপের সাড়া মিলতো, আজ কিনা সেখানেই জনগণ নিরুপায় হ'য়ে সাড়া দিচ্ছেন প্রকৃতির ডাকে। এর জন্য কোনো লজ্জা বা অনুশোচনা দূরে থাক, বরং ক্রমেই পরিবেশকে জঘন্যতম ক'রে তোলা হচ্ছে। কিন্তু অসহায়ভাবেই আমাদের এসব মেনে নিতে হচ্ছে—আবার আমরাই লজ্জিত হচ্ছি আমাদের এই সব কীর্তির জন্য।

তাছাড়াও গর্বিত হবার আশায় আমরা তিন বিপ্লবী বাঙলীর নাম স্মরণীয় ক'রে রাখতে যে কিস্তি চেলেছিলাম, তা বানচাল ক'রে দিয়ে অচিরেই এক অদৃশ্য হাত সরিয়ে দিলো বিনয়-বাদল-দীনেশের নাম। পরিবর্তে সটকাট ক'রে সাজালো 'বি-বা-দী' রূপে। যার ফলে আজ চোখে দেখতে বা কানে শুনতে পাওয়া যায় না বিনয় বাদল-দীনেশের নাম। ভবিষ্যতে সেটা আর পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। তাই আমাদেরই একদিন আফসোসের সীমা থাকবে না, এই ভুল পথে সম্মান জানাতে গিয়ে আমরাই বিনয়-বাদল-দীনেশকে বিবাদী হিসেবে চিহ্নিত করেছি ব'লে।

ইংরেজরাও তো তাই করেছিলেন।



এরা ছু'জন—লাট্টু আর শান্তিয়া। ছবিটি তোলা হয়েছিলো বিহারের তিলাইয়া বাঁধের কাছেই। মনে আছে, তখন গ্রীষ্মকাল। বাঁধের কাছেই যে রেস্ট্-হাউসটি আছে, তারই পেছনের ফাঁকা মাঠটায় গোরু চরাচ্ছিলো এই লাট্টু আর শান্তিয়া। ভরা ছুপুরের প্রচণ্ড রোদ তখন ঐ এলাকাটা গরমে তাতিয়ে তুলেছে। কংক্রীটের বিশ্রাম আবাসটি প্রায় বয়লার পর্যায়ে এসে গেছে, আর আমরা তখন ব'সে আছি তারই ভেতরে।

সেবার বিধান-সভার এক অধিবেশনে ডি-ভি-সির ব্যর্থতা নিয়ে

তুমুলভাবে সমালোচনা করছিলেন বহু সদস্য। ডাক্তার বিধান রায় প্রকৃত রোগ ধরতে পেরেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন কোলকাতায় অ্যাসেমব্লীতে ব'সে ব'সে এসব নিয়ে আলোচনায় খামোকাই সময় নষ্ট হবে। তার চাইতে সরে-জমিনে স্বচক্ষে এঁরা একবার কাজগুলো দেখে আসুক। তা হ'লেই সবাই শান্তিতে থাকবেন। তারপরই ঠিক হ'লো বিরোধী দলের আগ্রহী সভ্যদের নিয়ে একটি দল যাবে, ভারতের নবরূপের স্বাক্ষর দামোদর-ভ্যালী দেখতে। আর তখন চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ্‌ও দেখে আসবে। এসব ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেওয়া হ'লো তৎকালীন সেচ-মন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায়ের ওপর। ব্যবস্থা হ'লো স্পেশাল ট্রেনের। সঙ্গে সাহিত্যিক, রিপোর্টার, ফটোগ্রাফার ইত্যাদি নানাজনে সমৃদ্ধ হ'লো সেই দল। গুরুত্ব আর জৌলুস দুই-ই বৃদ্ধি পেলো।

বঙ্গ-বিহারের এই চত্বরটুকু ঘুরে-ফিরে দেখতে খুবই ভালো লাগছিলো। সেদিন এসেছি তিলাইয়া বাঁধ দেখতে। আমাদের দুপুরের আহার-ব্যবস্থা হয়েছে ঐ ছোট বিশ্রাম-আবাসটিতে। ঘর ছোট কিন্তু আয়োজন বৃহৎ। গতিকেই স্থান সঙ্কুলানের সমস্যা দেখা দিলো। তারই ভেতরে কোনো মতে ব'সে একটু বিশ্রামের বৃথা চেষ্টা করছি। কিন্তু বিশ্রাম তো চুলোয় গেলো, বরং মনে হ'লো ওখানে আর কিছুক্ষণ থাকলেই হাফ্‌-বয়েল হ'য়ে যাবো।

ঘরে তিষ্ঠানো দায় বুঝেই বাইরে চ'লে এলাম। খোলামেলায় দাঁড়িয়ে মনে হ'লো—আ-হ্‌ কী আরাম! শান্তি এলো মনে। আরও ভালো লাগলো ঘরের পেছনে বড় আম গাছটা দেখতে পেয়ে। দাঁড়ালাম গিয়ে তার ছায়ায়। তখন যেন মনে হ'লো শরীর মন দুই-ই সুস্থ।

এতো যে প্রচণ্ড গরম তবুও দেখলাম ছোট-ছোট দেহাতী ছেলে-মেয়েরা মাঠে গোরু নিয়ে চলাফেরা করছে। মাঝে মাঝে ছুটছে এদিক-ওদিক। আমি দাঁড়িয়ে দেখছি এসব, আর ভাবছি, ওদের কি গরম বোধ নেই? রোদগুলো কি ওদের চেনা?

ঠিক এই সময় দেখতে পেলাম, একপাল গোরুর পেছনে-পেছনে এগিয়ে আসছে ছোট একটি মেয়ে। দেখতে বেশ মেয়েটি। গোরুর দল চ'লে এলো অনেকটা আমার কাছেই। মেয়েটি প্রায় আরও কাছে চ'লে এলো।

আমি এক অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তি, তবুও এই দেহাতী মেয়েটি আমার দিকে তাকালো হাসিমুখ নিয়ে। ভারী মিষ্টি লাগলো। ভারী সুন্দর লাগলো ওর ঐ সরল হাসির মুখখানা। মনে মনে একটু আশ্চর্য হলাম বৈকি এক দেহাতী মেয়ের এই সঙ্কোচহীনতায়। কিন্তু বলতে কী, আমার মতো এক ঝানু শহুরে লোকেরই যেন সঙ্কোচভাব এলো। ওর হাসিমুখে তাকানো দেখে একটু বিব্রত বোধই করলাম। কিছু বলতে পারলাম না মুখে। তখনো দেখি মেয়েটি হাসিমুখ নিয়ে হেঁটে হেঁটে চ'লে যাচ্ছে। তাকাচ্ছে ফিরে ফিরে আবার।

আমার এবার ইচ্ছা হ'লো ওকে ডাকতে। ডাকলাম হাতের ইশারায়। সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েটি এমনভাবে চ'লে এলো এটা যেন ও আশা করেই ছিলো। কাছে এসে আমি কিছু বলবার আগেই ও কল্‌কল্ ক'রে অনেকগুলো কথা ব'লে ফেললো। বললো—'বাবুজী, আমার নাম শান্তিয়া। ঐ যে গাঁও, ওখানে আমরা থাকি। বাড়িতে আমার বাবা আছে—, মা আছে—' আরও কি সব যেন বললো। এতোগুলো কথা ব'লে সুন্দর এক ভঙ্গিতে ও দাঁড়িয়ে রইলো আমার সামনেই। মুখে তখনো সেই মিষ্টি হাসিটি। মুখের ভাবটা যেন, ও আমার কতো চেনা!

আমার তখন ওর সঙ্গে কথা বলার চাইতে একটা ছবি তোলার কথাই মনে হচ্ছিলো বেশী। ক্যামেরাটা খুললাম। বললাম—'একটু দাঁড়া তোর একটা ছবি তুলি।'

কিন্তু হায়! ফল হ'লো উল্টো। দেখি মেয়েটি পেছন ফিরে দে ছুট্। আমি বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম ক্যামেরা হাতে। সব বুঝি মাটি হ'লো।

ব্যর্থ চিত্তে মাঠের দিকে তাকিয়ে দেখলাম শান্তিয়া চ'লে যাচ্ছে আরও দূরে। ছুটতে ছুটতে দূরের ছেলেগুলোর কাছে গেলো, কি যেন বলাবলি করলো। তার পর মুহূর্তেই দেখি একটা ছেলের হাত ধ'রে আবার ছুটে আসছে শান্তিয়া আমার দিকে।

আমি তো দাঁড়িয়েই আছি সেইভাবে ক্যামেরা হাতে। এবার ছু'জনে এসে আমার সামনে দাঁড়ালো। হাঁফাতে হাঁফাতে শান্তিয়া বললো—'বাবুজী, আমি আর লাট্টু একসঙ্গে ছবি তুলবো। ছু'জনে একসঙ্গে। একলা আমার ভয় লাগে।'

আমি তখন ছবি তুলবার হারানো সুযোগ ফিরে পেয়েছি। মনে আমার ফিরে এসেছে এক নতুন আনন্দ। শান্তিয়ার কথাগুলো শুনে আমি হেসেই ফেললাম। বললাম—'আচ্ছা ঠিক আছে, তোদের ছু'জনেরই ছবি তুলে দিচ্ছি।'

ক্যামেরার ভিউফাইণ্ডারে চোখ লাগিয়ে দেখছি, শান্তিয়া অমনি লাট্টুর গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। আমাকে আর কিছু বলতে হ'লো না। লাট্টুকে শুধু বললাম শান্তিয়ার কাঁধে ওর হাতটা রাখতে। তাতে শান্তিয়া যেন আনন্দে গ'লে গেলো। ভাবেসাবে তখন মনে হচ্ছিলো, শান্তিয়াকে লাট্টু আরো কাছে টেনে নিলে ও খুশী হ'তো বেশী।

ছবি তুলে শান্তিয়াকে জিজ্ঞাসা করলাম—'শান্তিয়া, ও বুঝি তোর ভাই হয়?'

—'না বাবুজী, আমার ভাই নেই। ও আমাদের পাড়ার।' আর কিছু না ব'লেই আবার ছুটে চ'লে গেলো ছু'জনে। চলতে লাগলো মাঠের দূরের দিকে। তখনো হাত ধরা ছিলো ওদের।

*

এ ছবি প্রায় ত্রিশ বছর আগে তোলা। ছবিটি দেখলে আজো স্বভাবতই আমার মনে পড়ে ওদের কথা। তখন ছবি তোলার কথা ছাপিয়ে আর একটি কথা মনে উদয় হয়। জানতে ইচ্ছে হয়—শান্তিয়া কি এখনো লাট্টুর সঙ্গে আছে, না আজ ওরা পার্বতী আর দেবদাস।



ছবিটা জওহরলাল নেহরুর, কিন্তু ব্যাপারটি এক ঠিকাদারের। এখানে কথাটায় ব্যাকরণ না-থাকলেও কাহিনী প্রসঙ্গে এটা গ্রহণযোগ্য।

ফটোগ্রাফারদের কাছে জওহরলাল নেহরু সর্বদাই ছিলেন তাজমহলতুল্য। নেহরুকে কাছে পেয়ে কেউ ছবি তোলেনি, কিংবা ক্যামেরা বন্ধ রেখে কেউ তাজমহল দেখেছে—এমন দৃষ্টান্ত আছে কিনা জানি না। তেমন কোনো হিসেব কেউ রাখেনি ব'লে, না-হ'লে বিচার ক'রে দেখা যেতে পারতো—একটা নির্দিষ্ট সময়-কালের ভেতর

কার ছবি কত তুলেছে ফটোগ্রাফাররা। গুণতিতে নেহরুর ছবিই বোধ হয় বেশী হ'তো।

নেহরুর শেষ জীবনের কথা নয়, স্বাধীনতা লাভের বহু আগেও দেখা যেতো জনপ্রিয়তার শীর্ষে আসীন এই নেতা যেখানেই যখন গেছেন, সেখানেই যেন ফুটে উঠেছে একটা উৎসবের আমেজ। আর সেই উৎসবে মেতে উঠেছেন ছেলে-বুড়ো সবাই। আনন্দোল্লাসে কেউ জয়ধ্বনি দিচ্ছে 'পণ্ডিত নেহরু কী জয়', আবার কেউ বলছে 'জওহরলাল জী কী জয়'। পথের দু'ধারে সারিবদ্ধ উৎসুক জনতা ছুঁড়ে দিচ্ছে মুঠো মুঠো ফুল। এ-পথেই তাদের দেবতুল্য নেহরু যাবেন। গিয়ে সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে দর্শন দেবেন জনতাকে। সবাই রোদ-বৃষ্টি উপেক্ষা ক'রে বক্তৃতা শুনবে দীর্ঘ সময় ধ'রে। সর্বদাই দেখেছি, নেহরুর বক্তৃতা শ্রবণ অপেক্ষা বক্তৃতা-দর্শনই যেন বেশী তৃপ্তি ঢেলে দিতো সবাইর প্রাণে।

সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছিলেন নেহরু। যতদূর মনে হয় সেটা ১৯৩৬ সাল। তিনি আসাম ভ্রমণে বের হ'য়ে গোয়ালপাড়া থেকে গৌহাটির দিকে যাবার পথে এক স্থানে সভায় উপস্থিত হয়েছেন। বিস্তর লোক-জন জড়ো হয়েছে সেখানে। তার ভেতর আছে রাজনীতি থেকে শুরু ক'রে নানা-নীতির লোক। আমি গিয়েছি পত্রিকার সংবাদ-চিত্রের তাগিদে।

এই সভার যিনি উদ্যোক্তা ছিলেন তাঁকে আমরা জানতাম একজন অর্থান্বেষী দেশপ্রেমিক হিসেবে। অর্থাৎ মরসুমী নেতা। তাঁর পেশা ছিলো ঠিকাদারী। তিনি জানতেন, তাঁর এলাকায় পণ্ডিতজীর একটা মিটিং করতে পারলে, আখেরে বহু সুবিধার সুযোগ পাওয়া যাবে। তখন সুদে-আসলে সব আদায় ক'রে নেবেন এই আশায় তিনি এখানে টাকা ঢালতে কুণ্ঠিত হন নি। দেখতে পেলাম, সভার এলাকায় তিনি অহেতুক ব্যস্ততায় এদিক ওদিক ছুটছেন। যতদূর সম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জনে ব্যস্ত।

বক্তৃতা শেষে নেহরু উপবেশন করলেন। এ-সময় তাঁর হিন্দি ভাষণ অসমীয়াতে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন তৎকালীন আসামের নেতা গোপীনাথ বরদলৈ। আমি ক্যামেরা দেখিয়ে আগে-ভাগেই মঞ্চে উঠে বসেছিলাম। এবার নেহরুর একটা ভালো ছবি তুলবার আশায় আরও কাছে এগিয়ে গিয়েছি।

ক্যামেরা তাক্ ক'রে আছি নেহরুর দিকে, কিন্তু তেমন সুবিধামতো পাচ্ছি না বলে 'শাটার' টিপছি না। আমার এই অসুবিধাটুকু যার বোঝা দরকার তিনি ঠিকই বুঝতে পারলেন। দেখলাম সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মুখখানা ঘুরিয়ে একটু স্থিরভাবে তাকিয়ে রইলেন একদিকে। ছবি হ'লো। শাটারের আওয়াজ শুনতে পেয়ে এবার তিনি আমার দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে আমি ফিল্মের নম্বর পালটাচ্ছি। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হ'তেই তিনি একটু ঝুঁকলেন আমার দিকে। উনি আমাকে কিছু বলবেন বুঝতে পেরে আমিও একটু ঝুঁকে গেলাম। তখন সভা চলছে, সুতরাং মুখ খুব কাছে এনে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'ছবি তুলেছো ?'

আমি মাথা নেড়ে জানালাম।

তারপর প্রশ্ন করলেন—'তোমার ওটা কী ক্যামেরা ?'

আমি ক্যামেরার বিবরণ দিলাম কিছু।

তিনি বললেন—'ভারী সুন্দর ক্যামেরাটা। আমার একটা 'কনটাক্স' ক্যামেরা আছে। মাঝে-সাঝে ওটা ব্যবহার করি।

'ওটা তো 'মিনিয়েচারের' ভেতর সেরা ক্যামেরা।' আমি বললাম।

এ-পর্যন্তই ক্যামেরা সংক্রান্ত দু'চারটি কথা হয়েছিলো মাত্র। তারপরই আমি মঞ্চ থেকে নেমে এলাম, কারণ আমাকে তখুনি গৌহাটি ফিরে যেতে হবে। ছবি তৈরি ক'রে পাঠাতে হবে কলকাতায়। এর জন্য আমরা তিন বন্ধু মিলে একটা গাড়ি নিয়েই গিয়েছিলাম।

আমি মঞ্চ থেকে নেমেছি মাত্র, দেখি সেই ঠিকাদার-নেতা আমারই

দিকে হাসি-হাসি মুখে এগিয়ে আসছেন। আমি ঠিক আঁচ করতে পেরেছিলাম কেন আসছেন তিনি। কিন্তু তখন কেন জানি না আমার মাথায় এক দুষ্টু বুদ্ধি এসে গেলো। আমিও দাঁড়ালাম হাসিমুখে। ঠিকাদার কাছে এসেই অতি ব্যগ্রভরে আমাকে প্রশ্ন করলেন – 'ও মশাই ! পণ্ডিতজী আপনাকে কী বললেন ?'

এ-প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য আমি তো প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। সুতরাং নির্ভেজাল সত্যি কথা বলার ঢঙে জানালাম—'উনি আমার কাছে জানতে চাইলেন, কে এই মিটিং-এর আয়োজন করেছে। উনি খুব খুশী হয়েছেন এতো সুন্দর ব্যবস্থাপনার জন্য। আমি তো সবই জানি, তাই আপনার নাম বলেছি।'

ব্যস্—অমনি ঠিকাদার আমার হাত দুটি চেপে ধ'রে অতি বিনয়ে অনুরোধ জানালেন,—'আপনি কিন্তু এখন চ'লে যাবেন না। সভার পরে আমার বাড়িতে নিয়ে যাবো, আপনাদের জন্য একটু জলযোগের ব্যবস্থা রেখেছি। দেখবেন, চ'লে যাবেন না কিন্তু। ভুলবেন না যেন।'

কিন্তু আমার তো সময় নষ্ট করা চলে না তখন। অথচ ওদিকে আমার দুই বন্ধু চ'লে যেতে নারাজ। ছবিতে আমার ক্ষিদে মিটেছিলো, কিন্তু ওরা তো অভুক্ত অনেকক্ষণ। তাই, ঠিকাদারের এই অনুরোধ রক্ষা করতে বিশেষ আগ্রহী ছিলো বন্ধুরা। আমরা সেদিন শেষ পর্যন্ত তাঁর বাড়িতে গিয়েছি। উদর তৃপ্ত করেছি। উপরন্তু কিছু টাকার বিনিময়ে ঠিকাদারকে ছবির কপি দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গৌহাটি ফিরেছি।

*

আমার অ্যালবামের পাতায় নেহেরুর এই সুন্দর ছবিটি দেখলে আমার ফটোগ্রাফির কথা মনে হয় না, এমন কি নেহরুর সঙ্গে সেই আলাপের কথাও মনে আসে না। মনে আসে শুধু, আমি এক ঠিকাদারের ওপর বাটপারি ক'রে তাঁর বাড়িতে উদর-তৃপ্ত করেছি। উপরন্তু কিছু টাকা পেয়েছি, দক্ষিণার মতোই।



এই মোষটা দিব্বি ছিলো তার সঙ্গীদের দলভুক্ত হয়ে। তখন আমি একা-একা যাচ্ছিলাম এই পুকুরটার পাশ দিয়ে। কেন যাচ্ছিলাম তা আর আজ মনে নেই। তবে এটা স্মরণ আছে ঐ প্রায় জনমানবহীন এলাকাটি নদীয়া জেলায়। পুকুরের ওপারে দেখা যাচ্ছে শুধু কাঁচা ছাউনির একটা কুঁড়েঘর। তারই পাশের উন্মুক্ত খাটালের বাসিন্দা বোধকরি এই মোষগুলো। জলাশয়ে ঐ আমেজী মোষগুলোকে দেখে ইচ্ছে হ'লো একটা ছবি তুলি।

সেদিনটা জলে দেহ ডুবিয়ে রাখবার মতোই টেরিফিক্ গরম ছিলো। সকালবেলা আমি সূর্যদেবকে যতটা শান্ত-নরম ভেবে বের হয়েছিলাম, ততটা উগ্র-উত্তপ্ত হ'তে তার বেশী সময় লাগে নি। তাই

শেষ গ্রীষ্মের প্রভাতের প্রথম প্রহরকেই মনে হ'লো পরিপূর্ণ দ্বিপ্রহর। তার ওপর সেদিন গুমোট আবহাওয়া। রোদের তুলনায় তেজ বেশী। দেহে জ্বালা ধরিয়ে দেয়, মাথার টেম্পারেচার চরমে পৌঁছে যায়।

দেখেছি, রোদের অত্যাচার আমরা মেনে নিলেও, এই মোষ-জাতি কোনো কালেই তা মেনে নেয়নি। এরা নীরবে প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছে এইভাবেই। ফেস্‌টুনহীন, শ্লোগানহীন প্রতিবাদ। যেখানে জলাশয় দেখেছে, সেখানেই দলগতভাবে হোক আর একাই হোক—নেমে পড়েছে সূর্যদেবের অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পেতে। ময়লা-ঘোলার বাছ-বিচার নেই। জল হলেই হ'লো। মোষদের এই অবগাহন দৃশ্য অনেকেরই নজরে পড়ে।

এ-ছবিতে তেমন কিছু বিশেষত্ব থাকবে না জেনেও, তখনকার সময়োপযোগী এই দৃশ্যটির ছবি তুলতে ইচ্ছে হ'লো। আমি দাঁড়ালাম জলাশয়ের ধারে—যেখান থেকে মোষের পুরো দলের ছবি পাওয়া যাবে। ক্যামেরা খুলে ভিউফাইণ্ডার দিয়ে দৃশ্যটা ঠিকমতো দেখে নিচ্ছি, এমন সময় খেয়াল করলাম একটা মোষ জল থেকে তার দেহ অনেকটা তুলে ফেলেছে। এ অবস্থায় ছবি তুললে ঠিক হবে না। ওটার জন্য ছবিতে খুঁত থেকে যাবে মনে ক'রে ছবি তুললাম না। ভিউফাইণ্ডার থেকে মুখ তুলে তাকালাম ঐ গোলমেলে মোষটার দিকে। দেখি ওটাও ঠিক তাকিয়ে আছে আমার দিকে একদৃষ্টে। বুঝলাম না কী ব্যাপার! সুতরাং তখন ছবি না তুলে শুধু খেয়াল করছি ঐ মোষটাকেই। কিন্তু এ কি! এটা দেখছি ক্রমশ এগিয়ে আসছে আমার দিকেই একটু একটু ক'রে। তখন একেই রোদের ভেতর অতিষ্ঠ হ'য়ে গেছি, তার ওপর এই ঝামেলা সৃষ্টির জন্য মেজাজটা বিগড়ে গেলো। আমার দস্তুরমতো রাগ হ'লো এই মোষটার ওপর। ভাবলাম আমার ছবি তোলা মাটি ক'রে দিলো।

দল ছেড়ে এগিয়ে এসে মোষটা প্রায় অনেকটা আমার ক্যামেরার সামনেই দাঁড়ালো। এসে তাকিয়ে রইলো স্থির হ'য়ে। কিন্তু কেন?

শান্ত-নিরীহ এই মোষটা কেন ওভাবে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে রইলো তার কিছুই আমার বোধগম্য হ'লো না। ওর মনের কথা না বুঝলেও আমার মনে হ'লো ঐ-অবস্থায় মোষটার একটা ভালো পোর্টরেট-ছবি হ'তে পারে। সেই মতলবে ভিউফাইণ্ডারে ফোকাস-টোকাস ঠিক করছি, দেখি তখনো ওটা নিশ্চল। একদৃষ্টে তাকানো আমাব ক্যামেরার দিকে। মনে হ'লো ও যেন বলছে—আমার ছবি তোলো একটা। আচার্য জগদীশ বসু নাকি গাছের কথা শুনতে পেতেন, তেমনি আমিও যেন বুঝতে পারলাম এই পশুর নীরব ভাষা। সত্যিই, ছবি তুলবার জন্য এতোখানি সুযোগ কোনো লোক সহজে দেবে কিনা সন্দেহ, পশু তো দূরের কথা!

যাই হোক, সেদিন দলগতভাবে মোষের ছবি না তুললেও একক-ভাবে এই মোষের ছবিটি তুলে অখুশী হইনি। বরং একটু নতুনত্বের স্বাদ অনুভব করছিলাম। তারপর আর অপেক্ষা না ক'রে ক্যামেরাটা বন্ধ ক'রে কাছেই একটি গাছের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ালাম। কারণ মনে হচ্ছিলো, একটু বিশ্রাম না নিয়ে তখন আর পথ চলা যাবে না।

দূরে সরে এসেছি। কিন্তু কৌতূহল নিয়ে খেয়াল করছি ঐ মোষটাকে। দেখলাম, আমি চ'লে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ওটাও চ'লে যাচ্ছে তার দলভুক্ত হ'তে। কিন্তু একটু আশ্চর্য হ'লাম যখন ওটা দলে যোগদান না ক'রে এগিয়ে যেতে লাগলো ডাঙার দিকে। জল ছেড়ে ডাঙায় উঠলো। তারপর আবার দেখি এগিয়ে আসতে লাগলো আমারই দিকে। সে কি! আমার কাছেই আসছে দেখছি।

এবার অমি একটু চিন্তিত হ'লাম। শান্ত-নিরীহ ব'লে যাকে এতোক্ষণ সার্টিফিকেট দিয়েছি, সে কি শেষকালে হিংস্রভাব ধারণ করবে? যদি তাই হয়, তবে?

ছেলেবেলায় আমি এক গোরুর শিঙের গুঁতোয় বেশ কাবু হয়েছিলাম—সেকথা তখন স্মরণ করেই আমার দেহ যেন অবশ হ'য়ে এলো।

প্রায় হাতের কাছেই চ'লে এসেছে মোষটা। এসে আবার দাঁড়িয়ে রইলো আমার মুখের দিকে তাকিয়ে। আমার বুকের ভেতরটা তখন ধুক্‌ধুক্ করছে। আশু বিপদের আশঙ্কায় মুখে তখন শুধু 'হেই-হেই' করছি। এমন সময় দেখি পুকুর পাড় দিয়ে একটা লোক ছুটে আসছে আমার দিকে। বুঝতে পারলাম এদেরই অভিভাবক হবে। লোকটি হাসতে হাসতে কাছে এসে মোষটার পিঠে চাটি মারলো গোটাকয়েক। সরাবার চেষ্টা করলো, কিন্তু বৃথা হ'লো তার চেষ্টা। মোষ কিছুতেই যেতে রাজী নয়। অবশেষে লোকটা আমাকে অভয়বাণী শোনালো—'আপ্ যাইয়ে, কুছ ডর্ নেহি।'

আমি একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে চ'লে এলাম। একটা কথাও আমার মুখ থেকে বের হয়নি তখন। লোকটাকে ধন্যবাদ দেওয়া তো দূরে থাক।

*

এই ছবিটি দেখ'লে, আজো একটা কৌতুক-মিশ্রিত আনন্দ অনুভব করি। করুণভাবে তাকিয়ে থাকা গৃহপালিত-পশুর মুখখানা ভালো ক'রে দেখলে অনুভব করি—ওর যেন একটা কিসের আকাঙ্ক্ষা ছিলো। না-হ'লে কেনই বা ওভাবে ছবি তুলবার জন্য 'পোজ্' দিলো, আর কেনই বা আমার কাছে এসে আবার দাঁড়িয়ে ছিলো! বুঝলাম পশু চরিত্র বোঝা কঠিন। অনেকটা মানুষ চরিত্রের মতনই।



এই ছবিটি তুলবার সময় আমার হাত কেঁপেছিলো কিনা খেয়াল ছিলো না। কিন্তু মনে আছে, ছবি তুলবার সময়ই আমাব মনে বিষাদের গভীর ছায়া পড়েছিলো এবং তারপরেও নানা সময়ে সেই দৃশ্য স্মরণ ক'রে প্রাণে ব্যথা অনুভব করেছি। মনে মনে অনেক সময় প্রশ্ন করেছি নিজেকেই বহু কথার। কিন্তু আমি উত্তব দিতে পারিনি।

স্বাধীন ভারতের মর্যাদা রক্ষাকল্পে আমাদের বীর সেনানীরা সব সময়ই শৌর্য-বীর্যের যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছেন। আমরা তাঁদের জন্য নিশ্চয়ই গর্ব অনুভব করি। কিন্তু যাঁরা একদিন পরাধীন ভারতের গ্লানি মোছাতে অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন, তাঁদের জন্য আমরা কতটুকু অনুভব করি? আমরা পারি শুধু তাঁদের কিছু-কথা ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ ক'রে রাখতে এবং একটি স্মরণ দিবসে 'দোজ্ হু হ্যাভ ডাইড' ব'লে কিছু লোকের জমায়েতে দু-এক মিনিট

নীরবে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জানাতে। দু' মিনিটে শ্রদ্ধা! কিন্তু পারি কি তাঁদের আত্মবলিদানের মর্মকথা কালির বদলে রক্ত দিয়ে লিখতে? কিম্বা উপলব্ধি করতে তাঁদের কঠোর সাধনার ধারা? বোধ হয় পারি না। কারণ এঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্পৃহা ছিলো 'জয়হিন্দ' মন্ত্রের সুরে বাঁধা। এঁদেরই দেহের ধমনীতে ছিলো স্বাধীনতা-চেতনার ঘন লাল রক্ত। তাঁরা উৎসর্গ করেছিলেন সেই রক্ত মাতৃভূমিকেই। তাই স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত মুহূর্তে তাঁদের ক্ষত-বিক্ষত দেহ লুটিয়ে পড়লো ভারতমাতৃবক্ষে। মুখে শেষমন্ত্র উচ্চারিত হ'লো—জয় হিন্দ! তারপরই সব শেষ। তাঁরা দেখে গেলেন না, জেনে গেলেন না—তাঁদেরই রক্তের বিনিময়ে ভারতভূমি পবিত্র স্বাধীনতা লাভ করেছে। স্বাধীন ভারতের জমিতে সাক্ষী হ'য়ে প'ড়ে রইলো শুধু তাঁদেরই কঙ্কাল।

এই অস্থি-কঙ্কাল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হ'য়ে পড়েছিলো ইমফল থেকে কিছু দূরে, বিষেণপুরের পথে পাহাড়-টিলার ওপরে। এখানেই আজাদ-হিন্দ বাহিনী আর ইংরেজ দলের চরম সংগ্রামের রণক্ষেত্র রচিত হয়েছিলো। তখন মণিপুর-কোহিমার দুর্গম গিরি-প্রান্তর 'জয় হিন্দ' মন্ত্রে মুখরিত।

১৯৪৭ সালে, সম্ভবত শারদীয় মহাষ্টমীর দিন, ইমফল থেকে আজাদ-হিন্দ সংঘের যুবক সম্প্রদায় সেখানে গিয়েছিলো সেইসব অস্থি সংগ্রহ ক'রে ইমফলে নিয়ে আসতে। আমি তখন তিন বন্ধুসহ মণিপুর ভ্রমণে বের হ'য়ে ইমফলে আছি। সুযোগ পেয়ে আমরাও সেখানে গেলাম। পাহাড়-পর্বত পরিবেশে এক স্থানে যুবক সম্প্রদায় নামলো এবং তারা ছড়িয়ে পড়লো অস্থি সংগ্রহ ক'রে আনতে। তখনো দেখলাম চতুর্দিকে ছড়ানো আছে অতীত রণক্ষেত্রের বহু নিদর্শন। জাপানী বীর যোদ্ধাদের নিদর্শনও ছিলো কিছু। সংঘের ছেলেরা কিছু সময়ের ভেতরই যথাসম্ভব অস্থি সংগ্রহ ক'রে একস্থানে জড়ো করলো। মধ্যস্থলে স্থাপিত জাতীয় পতাকার তলে অস্থিগুলো রেখে

সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ালো যুবক দল। 'জয়হিন্দ' মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে সৈনিকের প্রথায় শ্রদ্ধা জানালো। আমি ছবি তুলে নতমস্তকে দাঁড়ালাম। মন বিষণ্ণ।

দিন কয়েক মণিপুরে কাটিয়ে আমরা ফিরে চলেছি মণিপুর রোড রেল-স্টেশন অভিমুখে। পথের দু'ধারে দেখে যাচ্ছি যুদ্ধের পরিত্যক্ত প্রচুর যানবাহন এবং সরঞ্জাম। কিছুটা উপলব্ধি করতে পারছি বিগত যুদ্ধের গুরুত্ব।

গাড়ী চলেছে। কখনো বা যাচ্ছি সর্পিল পার্বত্যপথে ধূসর-সবুজ বনরাজির ভেতর দিয়ে। মাঝে মাঝে দেখতে পাচ্ছি নীল আকাশের ছাউনি। 'মাউ' পেরিয়ে কোহিমার এলাকা অতিক্রম করবার সময় ড্রাইভার একস্থানে গাড়ি থামিয়ে বললো—'হিয়ামে মিলিটারী সাহাব লোককা কবর হ্যায়। দেখিয়ে গা?'

সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধু কমল চৌধুরী বললো—'ওটা খুব ইণ্টারেস্টিং। শুনেছি দেখবার মতো। চলতো দেখি।'

আমরা দেখতে গেলাম।

প্রথম দর্শনেই মনে একটা ব্যথার অনুভূতি হ'লো। বিস্তৃত এক এলাকায় বহু কবরের নিদর্শন। সারি সারি, মনে হয় শেষ নেই। আরও মনে হয়, সৈনিকের মৃতদেহগুলো পর্যন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে হুকুম পালন করছে। এঁরাই আজাদ হিন্দ ফৌজের বিরুদ্ধে কোহিমা অঞ্চলের লড়াইয়ে প্রাণ দিয়েছেন ব'লে জানলাম। নজরে পড়লো একস্থানে একটি মর্মর-প্রস্তরে লেখা আছে—

When you go home tell them of us and say,
For their tomorrow we gave our today.

*

কোহিমা থেকে রেল-স্টেশন পর্যন্ত পথটুকু এই ইংরেজী কবিতার কথাগুলো শুধু আমাকে আঘাত করেছে বারে বারে। ওঁরা কবরে শুয়ে থেকেও বলেছেন সবাইকে ওঁদের প্রাণ বিসর্জনের মহত্বের কথা।

কিন্তু কথাগুলোর মর্মার্থ খুঁজতে গিয়ে কেবলি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে—আজাদ-হিন্দ-ফৌজের সংগৃহীত অস্থির সেই ছবি। কিন্তু কোথায়! ওঁরা তো বলেন নি—তোমাদের ভবিষ্যতের জন্য আমাদের বর্তমান বিসর্জন দিয়েছি!

ওঁরা যে প্রাণ উৎসর্গ করেছিলো মাতৃভূমির জন্য।



একটি অতি মূল্যবান সংবাদ-চিত্র গ্রহণে ব্যর্থতার প্রমাণ দিয়ে, অবশেষে এই ছবিটি তুলতে পেরে অনেকখানি সান্ত্বনা পেয়েছিলাম সেদিন। অনেকটা ঘোলে মেটানো স্বাদ। কিন্তু আজ এই ছবির সঙ্গে জড়িত কাহিনীটুকু স্মরণ করলে খুঁজে পাই না সেই সান্ত্বনা। বরং দেখেছি নিজের ব্যর্থতার কথাই মনে পড়ে বেশী।

নেহরু সেবার মার্চ মাসে শান্তিনিকেতনে এসেছেন। বিশ্ব-ভারতীর আচার্য হিসেবে এইটিই তাঁর প্রথম পরিদর্শন। সেদিন

শান্তিনিকেতনের প্রাঙ্গণে পৌষ-উৎসবের মেলা ছিলো না বটে, কিন্তু পরিবেশের ভেতর ছিলো এক স্নিগ্ধ মধুর রূপের বিকাশ। সর্বজনপ্রিয় এই অতিথিকে অন্তরের শ্রদ্ধা আর সমাদর জানাতে সর্বত্রই ছিলো প্রাণের সাড়া।

নেহরু পরিদর্শন ক'রে যাচ্ছেন একটির পর একটি 'ভবন'। এলেন কলাভবনে, সঙ্গে উপাচার্য রথীন্দ্রনাথ। উনি কলাভবনের ঘরে ঘরে নানা বিভাগের কাজকর্ম দেখিয়ে যাচ্ছেন আচার্যকে। আমি ওখানে গিয়েছি ছবি তুলতে, কিন্তু মনোমতো পরিবেশ না পেয়ে পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছি শুধু। আমার বন্ধু আনন্দবাজারের ফটোগ্রাফার বীরেন সিংহ বোধহয় দু'একটা ছবি তুলেছে। কিন্তু আমি শুধু আশায় আছি নন্দবাবু কখন আসবেন। তখনই ছবি তুলবো—নেহরু আর নন্দবাবুর একসঙ্গে। না-হ'লে যাঁর হাতের স্পর্শে এই কলাভবনের প্রতিটি ঘর রঙীন চিত্র-সম্পদে উদ্ভাসিত, সেই শিল্পাচার্য নন্দলালের অনুপস্থিতিতে ছবি তুললে সে ছবিতে মর্যাদার ছাপ থাকবে না ব'লে মনে করেছিলাম।

ইতিমধ্যে অনিল চন্দ মশাই নন্দবাবুকে ঠিক খুঁজে নিয়ে এলেন ওদিকের একটা ঘর থেকে। কিন্তু নন্দবাবু তখনো বেশী এগিয়ে যেতে নারাজ ব'লে মনে হ'লো। তাই অনিলবাবু পেছন থেকেই রথীন্দ্রনাথকে ডাকলেন—'রথীবাবু, রথীবাবু—মাস্টার মশাই এসেছেন।' নেহরুর সঙ্গে কথা বলছিলেন রথীন্দ্রনাথ, অনিলবাবুর ডাকে পেছন ফিরে তাকালেন। নন্দবাবুকে দেখতে পেয়েই নেহরু আনন্দে ছুটে এলেন দুটি হাত বাড়িয়ে। এসেই জড়িয়ে ধরলেন, তারপর দুটি হাত ধ'রে আনন্দের আতিশয্যে বলতে লাগলেন—'আপনি কোথায় ছিলেন এতোক্ষণ? আপনার শরীর কেমন আছে, বাড়িতে সব ভালো তো—' এ-জাতীয় নানা প্রশ্ন ক'রে নেহরু অতি বিনয়ে মুখটা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন। নন্দবাবুও তেমনি মুখ নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন নেহরুর হাত ধ'রে। মুখ তুলে তাকাচ্ছেন না কেউ। নেহরুর এতো কথার

পর নন্দবাবু শুধু একটি কথা জানতে চাইলেন—'ইন্দু আসেনি বুঝি?'

নেহরু এবার চোখ তুলে নন্দবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—'না, ও আমার সঙ্গে নানা স্থান ঘুরে ঘুরে একটু পরিশ্রান্ত বোধ করছিলো। আমিই ওকে আনি নি, ব'লে এসেছি বিশ্রাম নিতে।'

আর কোনো কথা ছিলো না। দু'জনেরই কথা বোধ করি চাপা পড়ে গিয়েছিলো আনন্দের মুহূর্তে। কিন্তু এর পরেও তাঁরা দাঁড়িয়ে রইলেন মুখোমুখি। তেমনি মুখ নীচু ক'রে। তেমনি হাত ধরাধরি ক'রে। তেমনি নীরবে। কী অপূর্ব লাগছিলো দেখতে তখন!

আমি দাঁড়িয়ে দেখছি, দুই ভারত-লাল—জওহরলাল ও নন্দলালের এই মধুর মিলন-মুহূর্তকে। মুগ্ধচিত্তে তাকিয়ে আছি সারাক্ষণ, হারিয়ে ফেলেছি নিজেকে।

এইখানেই আমার একটা মারাত্মক গাফিলতি হ'লো। এঁরা দু'জন মুখোমুখি ওই রকমভাবে এতোক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন আমার চোখের সামনেই। আমার হাতে ক্যামেরা-ফ্ল্যাশ রেডি ছিলো। কিন্তু এঁদের সৌন্দর্যময় মিলনের রূপটি দেখতে এতো বেশী মগ্ন ছিলাম যে, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম ও-রকম একটি বিশেষ মুহূর্তের একটি সুন্দর ছবি তুলতে। যখন আমার হুঁশ হ'লো, তখন দু'জন হাত ছেড়ে দিয়েছেন। ওখান থেকে চ'লে যাচ্ছেন। উঃ কী ভুল করলাম! দারুণ একটা আফসোস আমার মনকে আঘাত করলো। লজ্জিত হ'লাম ফটোসাংবাদিক হিসেবে।

ভেবেছিলাম নন্দবাবু এর পরেও নেহরুর সঙ্গে থাকবেন, সুতরাং ছবি তোলার সুযোগ পাবো। কিন্তু হায়! কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখি নন্দবাবু নেই। আবার তিনি কোথায় গিয়ে চুপচাপ ব'সে আছেন কে জানে! নেহরু কলাভবন পরিদর্শন ক'রে যখন বাইরে চ'লে এলেন, তখন আমি নিরুপায় হ'য়ে অনিলবাবুকে ব্যগ্রভরে বললাম—'নন্দবাবুর সঙ্গে নেহরুর ছবি তোলা হ'লো না। অনিলবাবু আপনি দয়া করে একটা ব্যবস্থা করে দিন।'

অনিলবাবু অমনি দৌড়ে বাইরে গিয়ে নেহরুকে জানালেন যে, ফটোগ্রাফাররা নন্দবাবুর সঙ্গে একটা ছবি তুলতে চায়। নেহরু অমনি রাজী হ'য়ে দ্বিগুণ উৎসাহে ফিরে এলেন কলাভবনে আবার। এসেই নন্দবাবুর হাতের ভেতর দিয়ে নিজের হাত গলিয়ে এমনভাবে ধরলেন যাতে নন্দবাবু আবার না পালিয়ে যান। তারপরই আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন—'বলো কোথায় দাঁড়াবো আমরা?' বন্ধু বীরেন সিংহ দেখিয়ে দিলো একটি স্থান। সেখানে গিয়ে খুশী মনে দাঁড়ালেন বিশ্বভারতীর আচার্য, সঙ্গে শিল্পাচার্যকে নিয়ে। পেছনে দাঁড়ালেন অনিল চন্দ এবং সুরেন কর। আমাদের ক্যামেরা থেকে দু'বার ফ্ল্যাশের আলো পড়লো উজ্জ্বল দুই রত্নের মুখে। এবার নন্দবাবুর হাত ছেড়ে দিয়ে হাসিমুখে নেহরু তাকালেন আমাদের দিকে। আমার মন তখন পরিতৃপ্তিতে ভরা।

*

এ-ছবি সামনে রেখে আজ আনন্দ কতটুকু পাই বুঝতে পারি না। কেবলি মনে হয়, এঁদের সেই সুন্দর মুহূর্তের ছবি তুলতে ব্যর্থ হ'য়ে এই ছবি দিয়ে যেন সান্ত্বনা পেতে চেষ্টা করছি। সান্ত্বনা হয়তো পাই, কিন্তু শান্তি পাই না। তদুপরি আজকাল এ ছবি দেখলে, আর একটি বিশেষ ব্যথা অনুভব করি। তখন সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই তাঁদের আত্মার উদ্দেশে।



ক্যামেরা দিয়ে যখন এ-ছবিটি তুলেছিলাম, তখন তার অর্থ ছিলো এক। কিন্তু ঘণ্টা কয়েকের ভেতরই দেখা গেলো তার অর্থ পালটে গেছে। অর্থাৎ latent image অবস্থায় যেটি ছিলো সাধারণ, সেটি ডার্করুমে কাগজের ওপর পরিস্ফুট হ'য়ে উঠলো অসাধারণ রূপে, এক কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে।

এই ছবিটি তোলা হয়েছিলো, দক্ষিণ ভারতের এক উৎসব-দিনে কিশোরীদলের নৃত্যরত অবস্থায়। কিন্তু পরবর্তীকালে যখনি ও-ছবি হাতে নিয়ে মনের ভেতর উৎসব-নৃত্যের অনুভূতি আনতে চেষ্টা করেছি, তখনি খেয়াল করেছি, কেন জানি না আমার মন ভুলে পথে চ'লে গিয়ে শুধু অনুসন্ধান করে সেই মেয়েটির। এ-দলের ভেতরই সে ছিলো। ক্যামেরার মুখোমুখী, মুখটা বেশী নিচু ক'রে। মেয়েটির নাম গঙ্গাম্মা। আজ ভাবতে অবাক লাগে যে, দীর্ঘ কুড়ি বছর পরেও দেখতে পাই

সেই মাদ্রাজ শহরতলীর তাল-বস্তির কালো মেয়েটির স্মৃতি আমার মনকে আঁকড়ে আছে সেইভাবেই।

বছর কুড়ি আগের কথা। সেবারই একটা সর্বভারতীয় এগ্‌জিবিশন উপলক্ষ্য ক'রে আমার প্রথম মাদ্রাজ যাওয়া। আমরা জনা তিন-চার বঙ্গসন্তান উত্তর থেকে দক্ষিণমুখী যেতে যেতেই পথে অনুভব করছিলাম আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক পার্থক্য যেন ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেটা মাদ্রাজ শহরে পৌঁছবার পর এতো বেশী হ'য়ে দাঁড়ালো যে, তখন আমাদের মনে মনে চিন্তা করতে হয়েছিলো—আমরা ওদেশের সঙ্গে কতখানি ভারতবাসী হ'য়ে থাকতে পারি। কারণ বেশ-ভূষা, ভাষা-আচরণ, এমন কি খাদ্য তালিকায় পর্যন্ত আমরা ওখানে যেন তৃতীয়-ব্যক্তির সামিল হলাম।

আর যাই হোক, বঙ্গ-সন্তানের পক্ষে যে বিষয়টি সর্বাগ্রে বিবেচিত হয়, সেই মাছ-ভাতের একটি গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা করতে আমরা আস্তানা নিয়েছিলাম শহর থেকে কিছুটা দূরে এক বাড়িতে। অনেকটা পেয়িং গেস্টের মতোই। কাছেই ছিলো রেল স্টেশন। ইলেকট্রিক ট্রেন অনবরত আসছে আর যাচ্ছে। যাতায়াতের অসুবিধা বিন্দুমাত্র ছিলো না। মোটামুটি আমরা ওখানে ছিলাম ভালোই। ও-বাড়িতেই পরিচারিকার কাজে যে একটি তামিল-তনয়া নিযুক্ত ছিলো, তারই নাম গঙ্গাম্মা। খুব বেশী দূরে নয়, একটা তাল-বাগানের ভেতরে এক বস্তিতেই থাকতো ওর মা-ভাই-বোনেরা। বাপের কথা জানিনা।

গঙ্গাম্মা মেয়েটি তখন কিশোরী, সবে উঠতি বয়স। নির্ভেজাল কালো রঙের ছিপছিপে দেহ নিয়ে এই মেয়েটি বাড়ির কাজকর্ম করতো, আর ফাঁকে ফাঁকে এসে আমাদের কফি দিয়ে যেতো। তাছাড়া আমাদের খুটখাট্ ফাই-ফরমাস সব সময়ই তামিল করতো হাসিমুখে। অপূর্ব লাগতো দেখতে ওর কালো মুখমণ্ডলের ওপর একফালি মুক্তোর হাসি। তবে একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে অনুসন্ধান করলে গঙ্গাম্মার দেহে আর মনে একটা নতুন জোয়ারের সন্ধান পাওয়া যেতো। পুরুষের

চোখে কিছুটা আকর্ষণীয় হ'য়ে উঠেছিলো। কিন্তু বোঝা যেতো না সে-সম্বন্ধে গঙ্গাম্মা কতখানি সচেতন।

সেদিন ছিলো পঙ্গল-উৎসব। ভোর রাত্রেই শুরু হয়েছিলো উৎসবের নানা আয়োজন। শত শত নর-নারীর অবগাহনের জন্য সমুদ্রের পবিত্র জল সেদিন ঢেউ হ'য়ে এগিয়ে এসেছিলো। রঙীন বেশে মেয়েরা নানা রঙের ফুল মাথায় নিয়ে রঙ ছড়িয়ে দিচ্ছিলো সর্বত্র। এই উৎসবের দিনে আমরা সবাই একটু আমেজী মেজাজে ব'সে ছিলাম বাইরের প্রশস্ত বারান্দাটায়। ওখান থেকেই দেখছিলাম উৎসব-বেশের যাত্রী বোঝাই ট্রেন আসছে আর যাচ্ছে—টাম্বরম্ থেকে মাদ্রাজ-বীচ্ পর্যন্ত।

ঠিক এসময়ই একদল কিশোরী বাড়ির ভেতরে চ'লে এলো। হাতে একটা ঝুড়ি এনেছিলো, ওটা মাঝখানে রেখেই মেয়েগুলো নাচতে শুরু ক'রে দিলো। মুখের গানের তালে-তালে হাততালি দিয়ে ফুটিয়ে তুললো নাচের ছন্দ। দেখে মনে হ'লো অনেকটা আমাদের ব্রতচারী। তবুও সেটা ওদেশের পঙ্গল-নৃত্য জেনেই আমার ইচ্ছে হ'লো একটা ছবি তুলতে। ভেতরে গিয়ে ক্যামেরা নিয়ে এসে দেখি বাড়ির সবাই খুব আগ্রহ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এ-সময় লক্ষ্য করলাম গঙ্গাম্মাও সেজেগুজে এসে যোগ দিলো ওদের দলে। আমরা সবাই খুব খুশী হলাম, ভাবলাম ছবি তোলার আগ্রহেই হয়তো মেয়েটি দলে যোগ দিয়েছে।

ছবি মাত্র একটাই তুললাম। তারপর ওদের কিছু পয়সা দিতেই ওরা খুশী মনে চ'লে গেলো, আর দেখলাম গঙ্গাম্মাও হাসিমুখে গেলো ওদেরই সঙ্গে। পরে শুনলাম, ওরা সবাই নাকি গঙ্গাম্মার পরিচিত। দল বেঁধে ওরা আজ আনন্দ করবে।

সেদিন রাত্রিবেলা খাবার টেবিলে ব'সে জানতে পারলাম, গঙ্গাম্মা তখনো ফেরেনি। বাড়িতে সবাই ভাবলো ওর মায়ের কাছেই হয়তো গেছে। কাল সকালে ওখানেই না-হয় খোঁজ নেওয়া যাবে। তেমন

কিছু জরুরী নেই।

কিন্তু গোলমাল বেঁধে গেলো সকাল বেলাতেই। ওর মা কোথা থেকে খবর পেয়েছে গঙ্গাম্মার চ'লে যাওয়ার কথা। আর তাই নিয়ে এ-বাড়িতে এসে রাগারাগি কান্নাকাটির একশেষ করলো। মাঝে একবার মেয়ে আর তার বাপকে গালমন্দ দিয়ে নিলো কিছুক্ষণ। বাপ্‌টার নাকি রক্ত ভালো ছিলো না। যতদিন বেঁচে ছিলো ততদিন অশান্তির একশেষ করেছে। তাই মেয়েটাও সেই রক্ত পেয়েছে। ওদের নাকি কালো রক্ত।

তারপর যাবার সময় যা ব'লে গেলো, তাতে আমরা বুঝলাম, গঙ্গাম্মা বাড়ি ছাড়া হ'লেও, ঘর-ছাড়া হয়নি। এক রিকশাওয়ালা ছোকরা নাকি এসব ব্যবস্থার জন্য তৈরি হয়েছিলো বেশ কিছুদিন ধরেই। সুতরাং গঙ্গাম্মার এই পরিবর্তনে আমরা আপত্তিকর কিছুই খুঁজে পেলাম না সেদিন। শুধু আমার মনটা একটু খারাপ লাগলো ওকে আর দেখতে পাবো না ব'লে।

*

গঙ্গাম্মার পরবর্তীকালের জীবনযাত্রা কোন ধারায় প্রবাহিত হয়েছিলো, কিংবা তার যৌবনস্রোতে রিকশাওয়ালা ভেসে গিয়ে অন্য কোনো পুরুষ এসেছিলো কিনা—এসব প্রশ্ন আমার মনে স্থান পায়নি কোনোদিনই। তবে এ-ছবিটি দেখলে প্রথমেই আমার যেমনি চোখে ভেসে ওঠে ওর মুক্তোহাসির মুখটি, তেমনি আবার অন্যদিকে টেনে আনে কিছু বিষণ্ণতা—এ-ছবিরই রূপান্তরিত কাহিনীতে। তাই, তামিল দেশের পঙ্গল নাচের এ-ছবিতে আজ পাওয়া যায় শুধু গঙ্গাম্মার হারিয়ে যাওয়ার কথা।



ছবিতে দেখা যাছে, ১৯৫২ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে ভারত সিকিম সীমান্তে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন সিকিমের মহারাজকুমার পলডেন্ থণ্ডুপ্ নামগীয়াল। ছবি দেখেই বেশ অনুভব করা যায় আন্তরিকতার এক সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি। এ হার্টি ওয়েলকাম্।

এ-ছবি আজ পঁচিশ বছরের ওপর আমার সংগ্রহের তালিকায় অতি বিশেষ স্থান দখল ক'রে ব'সে আছে। সেই প্রথম থেকে আজ অবধি আমি একে পূর্ণ মর্যাদায় সযত্নে রেখেছিলাম। কল্পনায় রচনা করেছিলাম কত কিছু! কিন্তু দেখতে দেখতে বয়স বেড়ে গেলো এ-ছবির, আর রঙও পালটে গেলো। মনে হ'লো, প্রভাতের সূর্যোদয় রূপ নিয়েছে সায়াহ্নের নিস্তেজ সূর্যাস্ত রূপে। তাই আজ আনন্দের ছবিতে ফুটে উঠছে শুধু এক বিষাদ-মেশানো কাহিনী।

সেবার কলকাতা থেকে জনাকয়েক রিপোর্টার এবং ফটোগ্রাফারের সুযোগ এসেছিলো প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সঙ্গে সিকিম ভ্রমণের। দারুণ আকর্ষণীয় ব্যাপার সন্দেহ নেই। সিকিম তখন ভারতবর্ষের বন্ধুত্ব ও

সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল ছিলো অনেকখানি। তখনই কথা চলছিলো, ১৯৫৩ সাল থেকে সিকিমের প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ এবং বৈদেশিক বিষয়গুলোর দায়িত্বভার ভারতের হাতে নেবার। সম্ভবত এসবের পরিপ্রেক্ষিতেই, সেই দেশ পরিদর্শনে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নেহরু আর আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায়। সঙ্গে রয়েছেন কৃষ্ণ মেনন আর ইন্দিরা গান্ধী। এহেন সৎ-সঙ্গে কাশী-বাসের পুণ্যফল ভোগ করেছিলাম আমরা।

দার্জিলিং থেকে পেশক-রোড ধ'রে চলেছি আমরা এক অতি সুন্দর মেজাজে। আমাদের না ছিলো কিছু দায়িত্ব, আর না ছিলো কোনো ভাবনা-চিন্তার সুযোগ। আমরা কোথায় ছিলাম, কোথায় এলাম, আর কোথায় যাবো—সেসব চিন্তা অপরের। পথ বরাবর পাইন-বনানীর স্নিগ্ধ-সবুজ রূপ আর আকাশের বুকে জুড়ে বিস্তৃত নয়নাভিরাম পাহাড় দেশের সৌন্দর্য, আমাদের চোখে যেন আমেজ ঢেলে দিচ্ছিলো।

পর্বতমালার রূপশোভায় এতোই মগ্ন ছিলাম যে, আমরা কখন তিস্তা-ভ্যালী পার হ'য়ে রঙ্গীত নদীর খরস্রোতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চ'লে এসেছি সিকিম সীমান্তে তা খেয়ালই হয়নি। ব্যস্ততায় সবাইয়ের নামানামি, হুড়োহুড়ি দেখে বুঝলাম, অপর সীমান্তে এখন যেতে হবে ছোট এক সেতুর ওপর দিয়ে।

সেতুর ওপারেই সিকিম রাজার তরফে সবাই প্রস্তুত হয়েছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী আর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে। নেহরুর দিকে প্রথম অভ্যর্থনার হাত এগিয়ে এসেছিলো সিকিমের মহারাজকুমারের। তখনই এই ছবিটি তুলেছিলাম আমি।

পরের দিন দেখেছিলাম এই মহারাজকুমার কতখানি যোগ্যতায় এতো গুরুত্বপূর্ণ একটি দলের দায়িত্বভার নিয়ে নাথুলার সীমান্তে গিয়েছিলেন, এবং তারপরেও গ্যাংটকে নানা কাজের তদারকিতে তাঁর

কতখানি আন্তরিকতা ছিলো। তখন স্বভাবতই মনে হয়েছিলো, সিকিমের আগামী দিনগুলো পূর্ব গগনের সোনালী রোদে সমুজ্জ্বল থাকবে। ভেবেছিলাম, কাঞ্চনজঙ্ঘার স্বর্ণচূড়ার রূপ-সৌন্দর্য বুঝি গ্যাংটক থেকে কোনোদিনই ম্লান দেখাবে না।

কিন্তু সেই ভবিষ্যত যখন এগিয়ে এলো বর্তমানরূপে, যখন পলডেন্ থণ্ডুপ্ সিংহাসনের অধিকারী হ'য়ে সিকিমের দায়িত্বভার পেলেন চোগীয়াল রূপে, তখন থেকেই কেন জানি না সিকিমের আকাশে আস্তে আস্তে কালো মেঘ ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। অচিরেই আভাস মিললো ঝড়-তুফানের। একথা বুঝেছিলেন সবাই, তাই বিপদ সংকেত দেওয়া হয়েছিলো যথা সময়েই। কিন্তু তবুও বিধির লিখন খণ্ডানো গেলো না। অতি দ্রুত বেগে সিকিমের রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটিয়ে, নানা ঘটনা লিপিবদ্ধ হ'লো সিকিমের ইতিহাসের পাতায়। সিকিমের জনগণ তিনশত তিরিশ বছরের প্রাচীন সিংহাসন-প্রথা বাতিল ক'রে চোগীয়ালের নাম মুছে দিলেন চিরতরে।

*

আমরা জানি, অতীতে সিকিমেরই এক রাজা গোটা দার্জিলিং এলাকাটাকে তুলে দিয়েছিলেন ব্রিটিশের হাতে বিনাশর্তে। ১৮৩৫ সালে এক দানপত্রে লিখেছিলেন—'গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক তাঁহার সরকারের কর্মচারীদের ভগ্ন-স্বাস্থ্যোদ্ধারের পক্ষে দার্জিলিং-এর আবহাওয়া অনুকূল বিবেচনা করিয়া উক্ত স্থানটি পাইবার অভিলাষ ব্যক্ত করায়, আমি, সিকিমের রাজা, বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসাবে, এতোদ্বারা ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দার্জিলিং নামক স্থানটি দান করিলাম।'

এখানে সিকিম রাজত্বের অতীত আর বর্তমানের ভেতর গরমিলটুকু হচ্ছে—একজন স্বেচ্ছায় বিদেশীদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন দেশের এলাকা, আর অপরজন স্বদেশবাসীদের হাতে ন্যায্য অধিকার তুলে দিতে প্রকাশ করলেন অনিচ্ছা। ফলে, পলডেন্ থণ্ডুপ্ নামগীয়াল

নিঃসন্দেহে সিকিম-ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের যবনিকা টেনে দিলেন নিজের হাতে। আর নিজেই যবনিকা টানলেন চোঙ্গীয়াল-তন্ত্রের।

আমার তোলা এ-ছবি একদিন যেভাবে আন্তরিক শুভেচ্ছা বিনিময়ের একটা রূপ ফুটিয়ে তুলেছিলো, সেটা কালের বিবর্তনে আজ এক বিরূপ অর্থে রূপান্তরিত হয়েছে ব'লে মনে হয়। তাই এ-ছবি হাতে নিয়ে বুঝে উঠতে পারি না, এটা নেহরুর অভ্যর্থনার না চোগীয়ালের বিদায়ের।